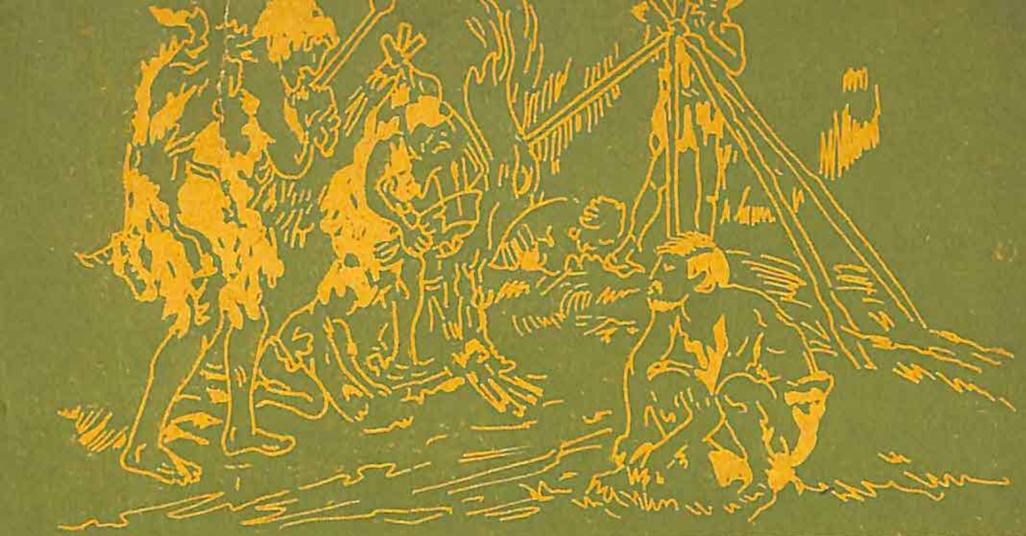
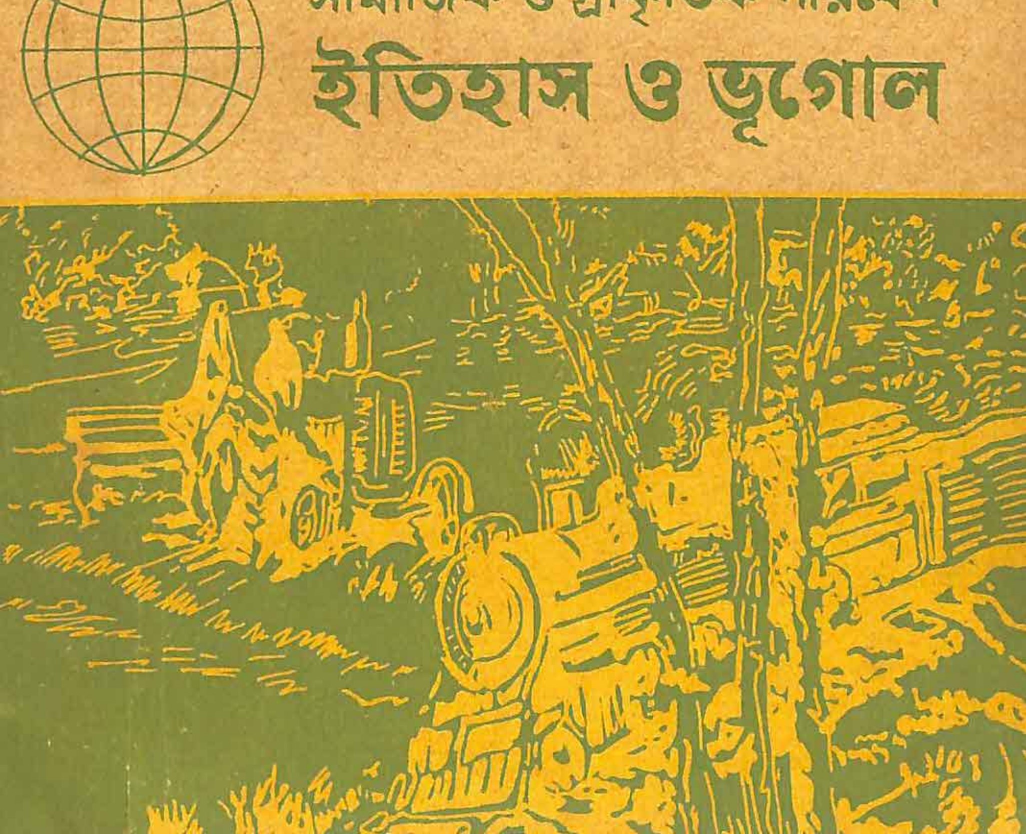


সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

ইতিহাস ও ভূগোল



সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

ইতিহাস ও ভূগোল

প্রথম ভাগ

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকার

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকর্তা
নব-সচিবালয়, কলিকাতা

মুদ্রাকর ঃ
বসুমতী করপোরেশন মিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা – ৭০০ ০১২

ভূমিকা

তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস ও ভূগোলের নতুন বই 'সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ : প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হল।

এই খণ্ডে আলোচিত হয়েছে মানবসভ্যতার বিকাশের আদিপর্ব— শিকারবৃত্তি তথা ফল-আহরণের অনিশ্চিত জীবনযাপন থেকে লৌহ-যুগে উত্তরণ।

বিকাশের মূল ধারাটিকে অনুসরণ করে, এক-এক যুগের প্রধান ঘটনাগুলিকে এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী সরল ভাষায়, গল্প বলার চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে রাজ্যের সকল জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের পরিচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের আশা, এই কাহিনী ছাত্রদের মনে যথার্থ ইতিহাসবোধ জাগিয়ে তুলবে ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে। একই সাথে সমগ্র মানবজাতির পার্থিব এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে তারা সন্ধানী তথা শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে।

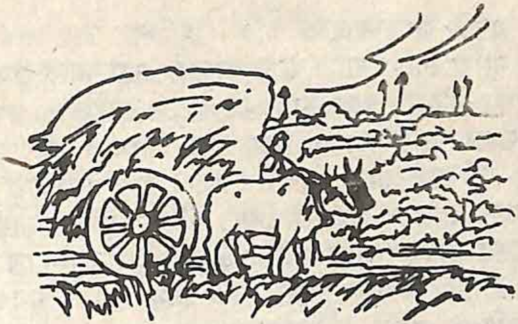
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হল। বইখানিকে শিশুদের জন্য আরও আকর্ষণীয় ও অর্থবোধক করে তোলার জন্য পরামর্শও একান্তভাবে কামনা করি।

বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকার
নব-সচিবালয়, কলিকাতা

বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ইতিহাস

সূচীপত্র



আজকের কথা

গোপালের বাড়ি কমলপুর গ্রামে। সে পড়ে গ্রামেরই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে। দশটার সময় মায়ের রান্না ভাত খেয়ে স্কুলে যায়। যাবার সময় ডেকে নিয়ে যায় তার বন্ধু রহিমকে। যাবার সময় গাঁয়ের পথে দেখে ধানবোঝাই গোরুর গাড়ি। মাস্টারমশাই আসেন পাশের গ্রাম থেকে সাইকেল চেপে। দূরের পাকা রাস্তা দিয়ে একটা মালবোঝাই লরি চলে যায়। মাঝে-মাঝে দূরের রেলস্টেশন থেকে ট্রেনের বাঁশির শব্দও শোনা যায়। স্কুলের পাশের মাঠগুলোতে কত ফসল। একদিকে পাকা সোনালী ধান। অন্যদিকের জমিতে আলু, সরষে, কপি, শাক—কত কী!

গোপালের বাবা ডাক্তার। তিনি আবার পঞ্চায়েতেরও সদস্য। রহিমের বাবা একজন বড়ো চাষী। তাঁর আছে একটা কলের লাঙল—ট্রাক্টর আর মাঠে জল দেবার জন্য একটা পাম্প। সন্ধ্যার সময় তাঁরা বসে গল্প করেন, রেডিও শোনেন, খবরের কাগজ পড়েন। গাঁয়ের আরও অনেক লোক আসেন। পঞ্চায়েতের নানা কাজের কথা হয়।

এই গাঁয়েরই মেয়ে গীতা থাকে কলকাতা শহরে। সেও পড়ে তৃতীয় শ্রেণীতে। একটু দূরের কারখানার বাঁশির শব্দে রোজ তার ঘুম ভাঙে উঠে কলের জলে মুখ ধোয়। মা খাবার তৈরি করে দেন। খাবার

সময় রোজ একটা উড়োজাহাজ খুব নীচু দিয়ে উড়ে যায়। তার বাবা বলেন, ওটা নাকি দিল্লি যায়। উড়োজাহাজ ওঠানামার জায়গাটা গীতা দেখে এসেছে। গীতার বাবা চা খেতে-খেতে রেডিওর খবর শোনেন। তারপর গীতাকে স্কুলে যাবার ট্রামে তুলে দিয়ে বাজারে যান। দশটার সময় তিনি অফিসে চলে যান। কোনো দিন ফিরতে দেরি হলে টেলিফোন করে বাড়িতে জানিয়ে দেন। গাঁয়ের মেলার সময় ট্রেনে চেপে তাঁরা বাড়ি আসেন। গোপাল, রহিম ও গীতা জানে না যে এমন দিনও ছিল যখন এসব কিছুই ছিল না। গ্রাম, শহর, চাষবাস, অফিস, কারখানা, রেডিও, গাড়ি, টেলিফোন—এসবের কথা মানুষ ভাবতেও পারত না। এমনকি রান্না করতে বা ঘরবাড়ি তৈরি করতেও জানত না মানুষ।



আজকের শহর

খুবই অবাক লাগছে, না? কিন্তু সত্যিই হাজার হাজার বছর আগে এসব কিছুই ছিল না। বহু বহু বছরের চেষ্টায় মানুষ একটু একটু করে এই সবকিছু তৈরি করেছে। এখন মানুষের সমাজের এইসব উন্নতিকেই আমরা বলি সভ্যতা। কেমন করে এই সভ্যতা গড়ে উঠল, তার আগেই বা মানুষ কেমন ছিল, তা জানতে খুবই ইচ্ছে করছে, তাই না? এসো, আমরা সেসব আলোচনা করি।

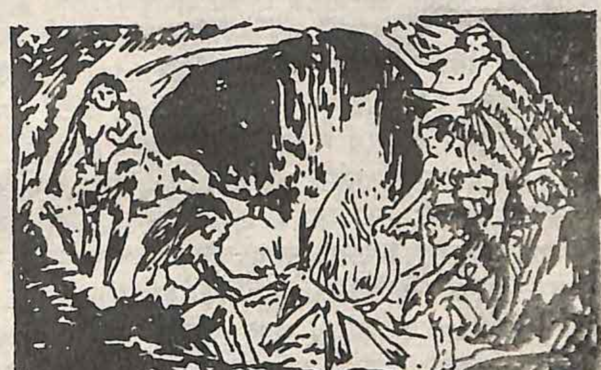
অনুশীলনী

বলো দেখিঃ

কলের লাঙল কে কে দেখেছ?
গ্রামে বেশির ভাগ মানুষ কোন্ লাঙল দিয়ে চাষ করেন?
শীতকালে মাঠে কী কী ফসল হয়?
গ্রামে রাস্তাঘাট, নলকূপ—এসবের ব্যবস্থা কারা করেন?
ডাক্তার আমাদের কী উপকার করেন?
শহরের রাস্তাঘাট কেমন?
বিদ্যুতে চলে—এমন দুটো গাড়ির নাম করো।
কারখানায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কী বলে?
চাষীরা কী কাজ করেন?
দেশ-বিদেশের খবর জানা যায় কী কী থেকে?

আদিম যুগের কথা

অনেক, অনেক দিন—হাজার হাজার কেন, লক্ষ লক্ষ বছর আগের কথা। তখন মানুষ থাকত বনের মধ্যে, অন্য জীবজন্তুর মতোই। তাদের বাড়িঘর, পোশাক বলতে কিছুই ছিল না। দেখতেও ছিল তারা প্রায় বনমানুষের মতো। কলকাতার চিড়িয়াখানা যারা দেখেছে, তারা সেখানে বনমানুষ দেখে থাকবে। অনেকটা মানুষের মতোই দেখতে। ফল খায়, বাদাম খায় কিন্তু কথা বলতে পারে না। সেই আদিম যুগের



আদিম যুগের মানুষ

মানুষও ওইরকম ছিল। গাছের ফলপাতা খেত, গাছের ডালে বা কখনও গাছের নীচে রাত কাটাত। প্রথম প্রথম নদীতে মুখ দিয়ে জল খেত। আবার নদীর মাছ আর কাঁকড়া ধরেও খেত।

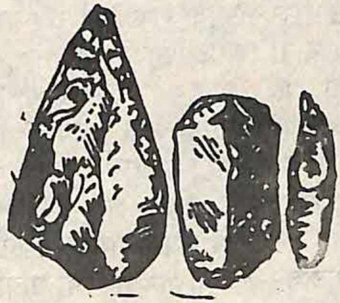
তখন পৃথিবীর অনেকটাই ছিল বনজঙ্গলে ভরা। মানুষকে থাকতে হত সেইসব বনে অন্য পশুর মতোই, পশুদেরই সঙ্গে। পশুরা মানুষকে আক্রমণ করেছে। পশুর গায়ে জোর বেশি। তাই বেশিরভাগ সময়েই মানুষ মরেছে। কিন্তু অন্য পশুর চেয়ে মানুষের বুদ্ধি বেশি। আবার হাত দুটোকে কাজে লাগাতে পারে বলে তার সুবিধাও বেশি। তাই পশুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মানুষ হাতিয়ার ব্যবহার করেছে।



গাছের ডাল হাতে আদিম মানুষ

গাছের ডালই ছিল মানুষের প্রথম হাতিয়ার। কিন্তু তা দিয়ে তো দূর থেকে লড়াই করা যায় না। সবসময় হাতের কাছে তাড়াতাড়ি পাওয়াও যায় না। সেদিক দিয়ে পাথর অনেক ভালো। মানুষ পাথরের সুবিধা বুঝল। দূর থেকে পাথর ছুঁড়েই লড়াই করা যায়। রাস্তায় কুকুর তাড়া করলে এখনও তো আমরা ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিই—তাই না? আবার গোটা পাথরের চেয়ে ভাঙা ধারালো পাথরের টুকরোতে কাজ বেশি হয়। ছুঁড়তেও সুবিধে, তা ছাড়া ধারালো হওয়াতে পশু মারাও সহজ। মাটি খুঁড়ে গাছের কন্দ (মূল) তুলে আনাও সহজ হল। তাই এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা পাথরই হল মানুষের প্রথম উন্নত হাতিয়ার। পাথর ভেঙে মানুষ অস্ত্র বানাতে শিখল। ওই সময়টাকে আমরা বলি 'পুরানো পাথরের যুগ'।

এসব খবর আমরা কেমন করে জানলাম? অনেক জায়গাতেই মাটি খুঁড়ে ওইরকম ভাঙা পাথরের অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। তাই দেখে নানা বিচার-বিবেচনা করে ওই সময়ের কথা জানা গিয়েছে। কলকাতার জাদুঘরে ওইরকম কিছু পাথরের অস্ত্রের নমুনা আছে।



আদিম মানুষের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো:
হাজার হাজার বছর আগে মানুষ থাকত —— মধ্যে।
প্রথম প্রথম মানুষ নদীতে —— দিয়ে জল খেত।
অন্য পশুর চেয়ে মানুষের —— বেশি।
দূর থেকে —— ছুঁড়ে লড়াই করা যায়।
ভাঙা পাথরের টুকরো বেশ ——।
পুরানো দিনের পাথরের অস্ত্রের নমুনা আছে কলকাতায় ——।

২। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে লেখো:
আদিম মানুষ প্রথমে (ফলপাতা/কাঁচা মাংস) খেত।
(পশুর/মানুষের) গায়ে জোর বেশি।
(গাছের ডাল/পাথর) ছিল মানুষের প্রথম হাতিয়ার।
পাথর ভেঙে মানুষ (হাতিয়ার/ঘর) বানাতে শিখল।

৩। বলো দেখি:
কোন্ সময়কে আমরা পুরানো পাথরের যুগ বলি?
পুরানো পাথরের যুগের কথা কেমন করে জানা গিয়েছে?
আদিম যুগের মানুষ কেমনভাবে থাকত?

মানুষ জোট বাঁধল, কথা বলল

এখন তো আমরা গাঁয়ে বা শহরে অনেক মানুষ একসঙ্গে বাস করি। একজনের বাড়িতে কাজকর্ম হলে অন্য সবাই এসে সাহায্য করেন। এরকম একসঙ্গে থাকা কীভাবে শুরু হল জান?

মানুষ দেখেছে বনে পশুরা লড়াই করে। যারা হারে, তারা অনেক সময়েই মরে যায়। যারা জেতে, তারা মরা পশুর মাংস খায়। তাহলে তো মাংসও খাওয়া যায়। মানুষও এরকম পশুর মাংস খেয়ে দেখল—ভালোই তো। অনেকক্ষণ পেট ভরা থাকে। গায়ে শক্তিও হয় বেশি। তাই মানুষ শুরু করল পশু মারতে। আগে পশুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য পশু মেরেছে। এখন খাবার মাংস পাওয়ার জন্য পশু মারতে শুরু করল। তবে সে সময় মানুষ কাঁচা মাংসই খেত।

ক্রমশ মানুষ বুঝল—একলা একটা পশু মারার চেয়ে অনেকে মিলে একটা পশু শিকার করা সহজ। অনেক মানুষ একসঙ্গে থাকলে অন্য পশুরাও আক্রমণ করতে ভয় পায়। তাই দরকার বুঝেই মানুষ জোট বাঁধল। শুরু হয়ে গেল দল বেঁধে একসঙ্গে থাকা।



দলবদ্ধ শিকার

একসঙ্গে থাকতে-থাকতেই অন্যজনকে ডাকার দরকারে মানুষ কথা বলতে শিখে ফেলল। অবশ্যই, তা আমাদের মতো নয়। প্রথম প্রথম হাত-পা-মুখ নেড়ে তারা নানারকম শব্দ করে মনের ভাব অন্যকে জানাত। খুব অবাক লাগছে না-কি? আজও আমরা ইশারায় কথা বলি না? মুখে একটিও শব্দ না করে হাত মুখ চোখ নেড়ে অনেক কথাই তো বোঝানো যায়। তখনও মানুষ তাই করত। নানারকম শব্দ থেকেই গড়ে উঠল মানুষের ভাষা।

বনে থাকলেও মানুষ চার পায়ের বদলে দুপায়ে হাঁটল, দৌড়াল। হাত দুটো দিয়ে দরকারি কাজ করল। খাবার জোগাড় করল। হাতিয়ার বানাল। তারপর কথা বলে একে অন্যকে মনের ভাব জানাল। এইভাবে ধীরে ধীরে অন্য পশুর সঙ্গে মানুষের অনেকখানি তফাত হয়ে গেল।

অনুশীলনী

১। ঠিক উত্তরটির তলায় দাগ দাওঃ
বনে (পশুরা/মানুষেরা) পরস্পর লড়াই করে।
প্রথম প্রথম মানুষ (খাবার/বাঁচার) জন্য পশু মেরেছে।
মানুষ বুঝল (দল বেঁধে/একলা) পশু শিকার করা সহজ।
প্রথমে মানুষ নানারকম (শব্দ করে/কথা বলে) মনের ভাব বুঝিয়েছে।
বনে থাকলেও (মানুষ/পশুরা) চারপায়ের বদলে দুপায়ে হাঁটল।

২। বলো দেখিঃ
অনেক মানুষ একসঙ্গে বাস করার কী সুবিধা?
মাংস খেয়ে মানুষ কী সুবিধা বুঝল?
শব্দ না করে কীভাবে মনের ভাব বোঝানো যায়?
অন্য পশুর সঙ্গে কীসে কীসে মানুষের তফাত হল?

গুহাবাসী মানুষ

এখন তো আমরা বাড়িতে বাস করি। রাত্রে শুই ঘরের মধ্যে। বড়োরা নানা জায়গায় কাজ করেন। কাজের শেষে বাড়িতে ফিরে আসেন। রান্নাবান্না করে সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া হয়। ঘরে থাকতে মানুষ কেমন করে শিখল? কেমন করে শিখল রান্না করা?

দরকার বুঝেই মানুষ দল বাঁধল। কিন্তু তখনও থাকে বনের মধ্যে। রাত কাটায় গাছের ডালে বা গাছের তলায়। শীতে-বর্ষায় খুবই কষ্ট হয়। খাবারের খোঁজে এখনও অনেক অনেক দূরে ঘুরতে হয়। অনেক সময় বুড়োরা বা বাচ্চারা সমানভাবে দলের সঙ্গে ঘুরতে পারে না। কখনও পশুদের আক্রমণে তারা মারাও যায়।

জীবনরক্ষার লাগিদেই মানুষ আশ্রয় নিল পাহাড়ের গুহায়। শুরু হল গুহাজীবন। গুহাই হল মানুষের প্রথম ঘর। বনে বনে অকারণে ঘুরে বেড়ানো কমে গেল। খাবারের খোঁজেই যেতে হত বনে। বুড়ো-বুড়ি বা বাচ্চাদের রেখে যেত গুহায়। শিকার করে বা ফলমূল নিয়ে গুহাতে ফিরে আসত। যা-কিছু আনত, সবাই মিলে ভাগ করে খেত। কিন্তু তখনও তারা রান্না করতে শেখে নি। শেখে নি আগুনের ব্যবহার। যদিও আগুন দেখেছে।

মানুষ দেখেছে ঝড়ের সময় গাছে-গাছে ঘষা লেগে বনে আগুন জ্বলে। মেঘের বিদ্যুৎ ছিটকে এসে আগুন লাগায় গাছে। পাথরে



দাবানল

ঠোকা লেগে আগুনের ফুলকি ছোটে আর তা থেকে আগুন লেগে যায় বনের শুকনো পাতায়।

বনে আগুন লাগলে গাছপালা-জীবজন্তু সব পুড়ে যায়। বনের আগুনকে আমরা বলি 'দাবানল'। প্রথমে মানুষ আগুনকে ভয় করত। বনে আগুন লাগলে পালিয়ে যেত। অন্য জীবজন্তুরাও পালাত। অনেক জীবজন্তু আবার পুড়েও মরত। গুহামানুষরা পোড়া জীব-জন্তু খেয়ে দেখল। পোড়া মাংস বেশ নরম, খেতে ভালো খাবার সুবিধাও বেশি, হজমও হয় তাড়াতাড়ি। এথেকেই মানুষ শিকার করে এনে মাংস পুড়িয়ে খেতে শিখল। শুরু হল রান্নার প্রথম ধাপ। সভ্যতারও প্রথম ধাপ শুরু হল।



আগুনে ঝলসে মাংস খাওয়া

প্রথমে মানুষ বনের আগুন গুহায় টেনে এনেছে। কোথাও পাথরে-পাথরে ঠুকে বা কাঠে-কাঠে ঘষেও আগুন জ্বালতে শিখেছে। এখনও হয়তো কোথাও কোথাও বুড়ো দাদুদের চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাতে কেউ দেখে থাকবে। আমরা যে দেশলাই জ্বালি, তাও তো বাক্সের বারুদের গায়ে কাঠির বারুদ ঘষে জ্বালানো।

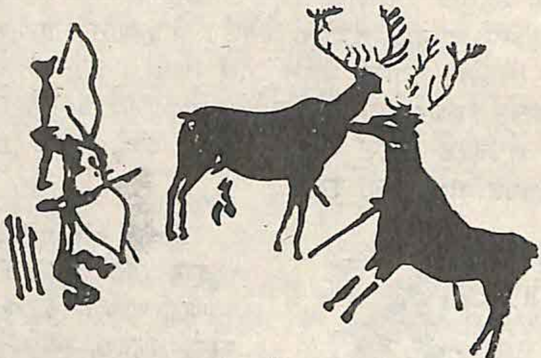
মানুষ দেখেছে, সব জীবজন্তু আগুনকে ভয় পায়। গুহার মুখে আগুন জ্বাললে হিংস্র জন্তুরা আর গুহার কাছে আসতে পারে না। বেশ নিরাপদে থাকা যায়। রাতের বেলা ওই আগুনে বেশ আলো হয়। দেখার সুবিধে হয়। তখনও তো মানুষ পোশাক পরতে শেখে নি। শীতের সময় আগুনের পাশে থাকলে বেশ আরাম পাওয়া যায়। এত সব সুবিধা দেখে মানুষ আগুনকে নিজের কাজে লাগাল।

এরপর তারা পোশাক বানাতে শিখল। শিকার-করা পশুর চামড়া গায়ে দিল। দেখল—শীতে বেশ আরাম লাগে। তাই পশুর চামড়া দিয়েই মানুষ পোশাক বানাল।

আরও কিছু শিখল মানুষ। কাঠকয়লা, গেরিমাটি দিয়ে গুহার দেয়ালে ছবি আঁকল। ছবিতে রঙও করল। তখন তারা আঁকত পশুর

ছবি, মানুষের ছবি, শিকারের ছবি—এইসব।

এসব কথা কেমন করে জানলাম? এখনকার মানুষ ওইসব গুহা খুঁজে পেয়েছে। তার মধ্যে ছাই, জীবজন্তুর হাড়, চকমকি পাথর পাওয়া গেছে। দেয়ালে ছবিও দেখা গেছে। তা থেকেই তখনকার দিনের কথা জানা গেছে।



গুহাচিত্র

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করোঃ

দরকার বুঝে মানুষ —— বাঁধল। —— রক্ষার তাগিদে মানুষ আশ্রয় নিল পাহাড়ের ——। গুহাই হল মানুষের প্রথম ——। খাবারের খোঁজে —— যেতে হত। গুহামানুষরা প্রথমে রান্না করত না, কেননা তারা —— ব্যবহার জানত না। বনের আগুনকে আমরা বলি ——। আগুনকে ভয় পায় সব ——। —— দিয়ে মানুষ প্রথম পোশাক বানাল। কাঠকয়লা, গেরিমাটি দিয়ে ছবিতে —— করল।

২। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে লেখোঃ

গুহাজীবন শুরু হওয়ায় বনে বনে ঘুরে বেড়ানো (কমে গেল/বেড়ে গেল)।
গুহায় যা কিছু আনত, সবাই মিলে (কাড়াকাড়ি/ভাগ) করে খেত।
মানুষ দেখল পোড়া মাংস খেতে (ভালো/খারাপ)।
মানুষের জীবনে (রান্না/খাওয়া) হল সভ্যতার প্রথম ধাপ।
পশুর চামড়া হল (মানুষের প্রথম (পোশাক/খাদ্য)।
শীতের সময় (আগুনের/জলের) পাশে থাকলে আরাম লাগে।

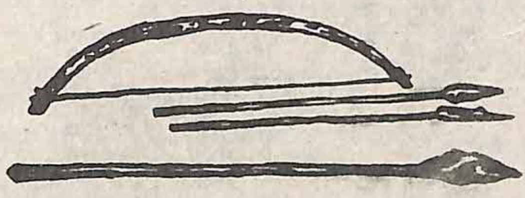
৩। বলো দেখিঃ

দাবানল কাকে বলে? কী কী থেকে মানুষ আগুন জ্বলতে দেখেছে? পোড়া মাংস খেতে কেমন? কোন্ মাংস তাড়াতাড়ি হজম হয়? আগুনকে সবাই ভয় পায় কেন? গুহার দেয়ালে মানুষ কীসের ছবি এঁকেছিল?

উন্নত হাতিয়ার

এমনি করেই বহুদিন কেটে গেল। মানুষ এখন আর এবড়ো-খেবড়ো বা ভোঁতা পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করে না। ঘষলে পাথরও যে মসৃণ আর ছুঁচালো হয়, এটা সে বুঝেছে। আর তাই পাথর ভেঙে আর ঘষে নানান রকমের অস্ত্র তৈরি করেছে। হাতুড়ি, ছুরি, কুড়ুল বানিয়েছে। বর্শা, তীর-ধনুক, মাছ ধরার বঁড়শি তৈরি করেছে। পাথর, গাছের ডাল, এমনকি জীবজন্তুর হাড় দিয়ে হাতলও লাগিয়েছে। এতে অনেক বেশি কাজের সুবিধা হয়েছে। হাতিয়ারগুলো অনেক উন্নত হয়েছে। পাথরের বাটি, পাত্র, এমনকি কিছু কিছু গয়নাও বানিয়েছে এ সময়ে।

এই সময়টাকেই আমরা বলি 'নতুন পাথরের যুগ'।



নতুন পাথরের যুগের হাতিয়ার

অনুশীলনী

উত্তর দাও:

পাথর ঘষলে কেমন হয়? আদিম মানুষ পাথর দিয়ে কী কী অস্ত্র বানিয়েছিল? হাতিয়ারগুলো কীভাবে উন্নত হল? অস্ত্র ছাড়া পাথর দিয়ে আদিম মানুষ আর কী বানিয়েছিল? নতুন পাথরের যুগ কাকে বলা হয়?

পশুপালন

এখন তো গাঁয়ের অনেক বাড়িতে একটা দুটো গোরু-ছাগল থাকে। এগুলো আমরা পুষি। শহরেও কেউ কেউ পোষেন। একটা কুকুর বা বিড়াল অনেক বাড়িতেই দেখা যায়। এইরকম জীবজন্তু পোষা মানুষ কখন শুরু করল?

একদিন বনের পশুকে মানুষ ভয় করেছে। তারপর মাংস খাবার জন্যে পশু শিকার করেছে। তারও পরে পশুকে পোষ মানিয়েছে।

কোনো দিন হয়তো গুহামানুষরা শিকার করতে গেল। দু-চারটে বাচ্চা পশু ধরা পড়ল। শিকারীরা জ্যান্ত বাচ্চাই গুহায় নিয়ে এল। তাদের ছেলেমেয়েরা ওইসব বাচ্চা পশু নিয়ে খেলতে লাগল। বাচ্চা পশুগুলো থাকতে-থাকতে তাদের বশ হয়ে গেল। সেই বাচ্চারা ক্রমে বড়ো হল। পরে তাদেরই আবার বাচ্চা হল।



মানুষের পালিত পশু

মানুষ দেখল বেশ তো! পশুকে পোষ মানালে বাড়িতে বসেই আরও নতুন পশু পাওয়া যায়। বনে শিকার না পেলে ঘরে পশু মেরে মাংস পাওয়া যায়। এখনও তো আমরা মাংস খাবার জন্যেই ছাগল ভেড়া বাড়িতে পুষি, তাই না?

গুহামানুষরা তখন জ্যান্ত পশুই ধরে আনতে লাগল। শুরু হয়ে গেল মানুষের পশুপালন। পশুদের মধ্যে প্রথমে পোষ মেনেছিল কুকুর।

কোনো একদিন হয়তো বাছুর-সমেত গাইগোরু ধরা পড়ল। গুহাবাড়িতে ছেলেরা দেখল বাছুর তার মায়ের দুধ খাচ্ছে। তাই দেখে

তারাও গোরুর বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খেল। দেখল মিষ্টি তো বটেই, পেটও ভরে। তখন দুধ খাবার জন্যেও গোরু ধরে আনা আর গোরু পোষা শুরু হল। পরে ঘোড়া এবং অন্যান্য জন্তুও এল এভাবেই। সভ্যতা আর একধাপ এগোল।

অনুশীলনী

১। ফাঁকা জায়গায় ঠিকমতো কথা বসাওঃ
অনেক বাড়িতেই আমরা গোরু-ছাগল ——। একদিন —— বনের পশুকে ভয় করেছে। গুহার ছেলেরা —— পশু নিয়ে খেলতে লাগল। গুহাবাড়িতে বাচ্চা পশুরা ক্রমে বড়ো হল, তাদের আবার —— হল। বাছুর তার মায়ের —— খায়। বাছুরের দুধ খাওয়া দেখে ছেলেরাও —— খেতে শিখল। পশুদের মধ্যে প্রথমে পোষ মেনেছিল ——।

২। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখোঃ
প্রথমে মানুষ (মাংস খাবার/পোষার) জন্যে পশু শিকার করেছে।
গুহাবাড়িতে ছেলেমেয়েরা (জ্যান্ত/মরা) বাচ্চা নিয়ে খেলতে লাগল।
বাচ্চা পশুগুলো বাড়িতে থাকতে-থাকতে (বশ/রাগী) হয়ে গেল।
বাছুর তার মায়ের (দুধ/মাংস) খায়।
পশুপালনের সঙ্গে (সভ্যতা/বন্যতা) আর একধাপ এগোল।

৩। বলো দেখিঃ
কেমন করে মানুষ পশুপালন শিখল?
বাড়িতে পশু পুষলে কী সুবিধা হয়?
ছেলেরা কেমন করে পশুর দুধ খেল?
কোন্ পশু প্রথমে মানুষের পোষ মেনেছিল?
পশুপালন শিখে মানুষের কী সুবিধা হল?
বাচ্চা পশুগুলো বড়ো হবার পর কী হল?

গোচারণ

পশুকে বাড়িতে পুষলেই তো হবে না। তাদের তো খেতেও দিতে হবে। আমরা পোষা জীবজন্তুদের খেতে দিই। গোরু-মোষ গাঁয়ের মাঠে চরাতে নিয়ে যাই। গুহামানুষদেরও ভাবতে হল ধরে-আনা পশুদের খাবারের কথা। কেননা ক্রমেই তাদের পালিত পশুর সংখ্যা বাড়ছে। তাই তাদের জন্যে চাই অনেক ঘাস। কিন্তু পশুদের খাওয়াতে-খাওয়াতে সেখানকার ঘাসও যায় ফুরিয়ে। তখন আবার অন্য জায়গায় যেতে হয় ঘাসের খোঁজে। কোথাও বেশিদিন থাকা যায় না।



এর আগে মানুষ পশু শিকার করার জন্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরত। এখন পোষা পশুর খাবারের জন্যে ঘুরতে লাগল। পশুর পাল তারা তাড়িয়ে নিয়ে যেত। যেত ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সবাইকে নিয়ে দল বেঁধে। যাবার সময় ঘরের সব জিনিসপত্রও সঙ্গে নিয়ে যেত।

স্থায়ী ঘরবাড়ি যাদের নেই, দরকারমতো নানা জায়গায় যারা ঘুরে বেড়ায়, আমরা তাদের বলি 'যাযাবর'। পশুপালন শুরু করার পর মানুষও যাযাবর হয়ে উঠল।

এখনও গাঁ-শহরের গরিব মানুষেরা অনেক সময় ঘর ছেড়ে যায়। যাবার সময় ছোটো ছেলেদের নেয় কোলেপিঠে, মালপত্র নেয় মাথায় করে। আর গোরু-ছাগল থাকলে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে হেঁটে যায়। তখনকার মানুষও তাই করত। ছোটোদের কোলেপিঠে নেওয়া গেল। বুড়োবুড়ি আর মালপত্র নিয়ে অসুবিধে হল। তখন পশুকে কাজে লাগাল। পশুর পিঠেই মালপত্র, বুড়োবুড়ি আর ছোটোদের চাপিয়ে দিল।

এরপর মানুষ বানাল গাড়ি। তারা দেখেছে গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে চলে। গাছের ডালের বা বাঁশের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ভারী জিনিস সহজে টানা যায়। এই অভিজ্ঞতাটি তারা কাজে লাগাল। গোল-গোল করে গাছের গুঁড়ি কাটল। চাকা হল। গোল পাথর দিয়েও চাকা বানাল। চাকার মাঝে ফুটো করল। এইভাবেই তৈরি হল গাড়ি। আমাদের গোরুর গাড়িরই প্রথম অবস্থা আর কী! শেষে ওই গাড়ি টানতে

পশুকেই জুড়ে দিল। গড়গড়িয়ে গাড়ি চলল। অনেক সহজে, অনেক তাড়াতাড়ি।



যানবাহন—গোরুর গাড়ি

চলার পথে মাঝে মাঝে নদীও পড়ে। পার হবার কী উপায়? কাঠ তো জলে ভাসে! ডুবে যায় না। ভাসা কাঠে চেপে নদী পার হল। কয়েকটা কাঠ একসঙ্গে বেঁধে ভেলা, বানাল। এই হল প্রথম নৌকো। তারপর হল ডোঙা। তারপর ধীরে ধীরে মানুষ কত রকমের নৌকো বানিয়েছে। বড়ো বড়ো জাহাজও গড়েছে।

দূর আর দূর রইল না। পশুতে টানা গাড়ি মানুষের খাটুনি কমিয়ে দিল। মানুষ ভেলা বা নৌকোয় জলপথে যাতায়াত শুরু করল। আরও এগোল মানুষের সভ্যতা।

অনুশীলনী

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখোঃ

পশুপালন শুরু করে মানুষ হল (গুহাবাসী/যাযাবর)।
গাছের গুঁড়ি (লাফিয়ে/গড়িয়ে) চলে।
গোল গুঁড়ি বা পাথরের (মাঝে/পাশে) ফুটো করে চাকা বানাল।
নদী পার হবার জন্যে মানুষ (নৌকো/গাড়ি) বানাল।

২। শূন্যস্থান পূরণ করোঃ

পশুকে বাড়িতে —— তো হবে না। তাদের তো —— দিতে হবে। আমরা পোষা ——দের খেতে দিই। গোরু-মোষ গাঁয়ের —— চরাতে নিয়ে যাই। স্থায়ী —— যাদের নেই, দরকারমতো নানা —— ঘুরে বেড়ায়, আমরা তাদের বলি ——। পশুতে টানা —— মানুষের খাটুনি —— দিল। নৌকো বানিয়ে মানুষ —— জয় করে নিল।

৩। বলো দেখিঃ

পশুপালন শিখে মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হত কেন?
অন্য জায়গায় যাবার সময় মানুষ পশুকে কেমনভাবে কাজে লাগাল?
মানুষের তৈরি গাড়ি গড়গড়িয়ে চলল কী করে?
নদীকে কীভাবে মানুষ জয় করল?
পশুতে গাড়ি টানায় মানুষের কী সুবিধা হল?

চাষবাস

এতদিন মানুষ বনের গাছপালা থেকে বা বনের পশু শিকার করে খাদ্য জোগাড় করেছে। পশুপালন করার পর অবশ্য খাদ্য পাওয়া অনেকটা সহজ হয়েছে। পোষা পশুর কাছ থেকে মাংস আর দুধ— দুটোই পাওয়া গেছে। ফল, মাংস আর দুধ তখন মানুষ খেয়েছে।

এখন তো আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত বা রুটি। তার জন্যে মাঠে ধান বা গমের চাষ করা হয়। মানুষ কেমন করে এই চাষ-করা শিখল?

পশুর খাদ্য জোগাড় করতে গিয়েই মানুষ একরকম ঘাসের দানা দেখল। পশুরা সেগুলো মজা করে খায়। ঐ দানাগুলো মাটিতে পড়লে তা থেকে নতুন গাছ হয়। সেইসব গাছে আবার অনেক দানা হয়। মানুষও সেই দানা খেয়ে দেখল। হ্যাঁ, খারাপ নয়, খাওয়া যায়। তখন নানা জায়গা থেকে ওই দানা অনেক জোগাড় করে আনল মানুষ। কিছু পশুদের খাওয়াল, কিছু নিজেরা খেল। আর কিছু দানা কাছের মাটিতে ছড়িয়ে দিল। তা থেকে নতুন ফসল ফলল। চাষের কাজ শিখে ফেলল মানুষ। খাদ্য জোগাড় করার বদলে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখে গেল। সেদিন মানুষের কী আনন্দ! প্রকৃতিকে জয় করতে শিখল। খাবারের ভাবনা থাকল না।



কাস্তে হাতে শস্য তুলছেন কৃষক

চাষ তো শিখল। কিন্তু বেশি জায়গায় চাষ করা যায় কিভাবে? ভাবতে ভাবতেই মানুষ উপায় বের করেছে। প্রথমে গাছের ডাল বা পাথরের ফলা দিয়েই মাটি খুঁড়েছে। তারপর এসেছে লাঙল। প্রথম-প্রথম মানুষেই লাঙল টেনেছে। তারপর পোষা গোরু-মোষ-ঘোড়াকে লাঙল টানতে লাগিয়েছে। লাঙলে পাথরের ফলা লাগিয়েছে।

জল পেলে গাছ বা ফসল ভালো হয়—এটা মানুষ বুঝেছে। তাই আকাশের জল না পেলেও নদীনালা, খানাখন্দ থেকে ফসলে দরকার-মতো জল দিতে শুরু করেছে। আজও নানাভাবে মাঠে চাষের জল দেওয়া হয়, তা আমরা দেখছি। চাষ করে তখন মানুষ ফলিয়েছে ধান,



জমিতে জল দেওয়ার কাজ

গম, যব। এগুলো ফলে অনেক বেশি। তাই এগুলোই মানুষের প্রধান খাদ্য হয়েছে। চাষ করতে গিয়ে আরও একটা হাতিয়ার তৈরি হয়েছে—ফসল কাটার কাস্তে। প্রথম-প্রথম মানুষ পাথরের কাস্তে বানিয়েছে।

চাষ শেখার ফলে মানুষের জীবনে দুটো বড়ো পরিবর্তন এসেছে। তারা খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছে। খাবারের অভ্যাসও পালটেছে। আর চাষ দেখাশোনার জন্যে জমির কাছাকাছি থাকার দরকার হয়েছে। সব জায়গায় তো গুহা নেই। তাই মানুষ গাছের ডালপাতা, পাথর, ঘাস দিয়ে ঘর বানিয়েছে। তৈরি হয়েছে স্থায়ী ঘরবাড়ি।

প্রথম যুগের গ্রাম গড়ে উঠেছে এভাবেই।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও:

পশুর —— জোগাড় করতে গিয়ে মানুষ একরকম ঘাসের —— দেখল। পশুরা সেগুলো —— করে খায়। ঐ দানাগুলো —— পড়লে তা থেকে —— গাছ হয়। সেইসব —— আবার অনেক —— হয়। —— জল না পেলেও —— খানাখন্দ থেকে —— দরকারমতো জল দিতে শুরু করেছে।

২। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে লেখো ঃ

পশুপালন করার পর খাদ্য পাওয়া অনেকটা (সহজ/কঠিন) হয়েছে।
দানাগুলো মাটিতে পড়লে তা থেকে নতুন (গাছ/দানা) হয়।
ধান, গম, যব—এগুলো ফলে অনেক (বেশি/কম)।
প্রথমে মানুষ (কাঠের/পাথরের) কাস্তে বানিয়েছে।
চাষ শেখার ফলে মানুষের খাবারের (সময়/অভ্যাস) পালটেছে।

৩। উত্তর দাও ঃ

পোষা পশুর কাছ থেকে মানুষ কী কী পেয়েছে?
আমাদের প্রধান খাদ্য কী?
কেমন করে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে শিখল?
চাষের জন্য মানুষ কী কী হাতিয়ার বানাল?
চাষ শেখার ফলে মানুষের জীবনের আর কী কী পরিবর্তন হয়েছে?
প্রথম গ্রাম গড়ে উঠল কীভাবে?

চাকা

ফসল তো হল অনেক। সব ফসল একবারে খাওয়া যায় না। কিন্তু যাতে নষ্ট না হয় তেমন করে রাখা যায় কীভাবে? ভালো ভালো পাত্র চাই। তখন তো আর এখনকার মতো মরাই, গোলা—এসব বানাতে জানত না তারা।

পাথর ঘষে মানুষ আগেই বাটি ও অন্যান্য পাত্র বানিয়েছে। এখন শুরু হল মাটির পাত্র তৈরির কাজ। রোদে শুকালে কাদামাটি শক্ত হয়। পোড়ালে হয় আরও শক্ত আর টেকসই। এসব মানুষ এর মধ্যে বুঝে ফেলেছে। কাদামাটি দিয়ে মাটির পাত্র তৈরি শুরু হল। তারপর



কুমোরের চাকা

বুঝল—একটা চাকার উপর কাদামাটি রেখে চাকাটাকে ঘুরিয়ে আঙুলের কায়দায় নানারকম পাত্র তৈরি করা যায়। আজও গাঁয়ের কুমোররা এভাবেই মাটির জিনিসপত্র তৈরি করেন। মাটির কলসি, কুঁজো, জালা, গেলাস, হাঁড়ি আমরা আজও ব্যবহার করি।

অনেক কলসি-কুঁজোর গায়ে নানারকম নকশা কাটা থাকে। তখনকার মানুষও ওইভাবেই মাটির পাত্রে নকশা, ছবি এঁকেছে। তাকে শুকিয়ে আর পুড়িয়ে শক্ত করেছে। তারপর সেইসব পাত্রে ফসল রেখেছে। মাটির নীচে পাওয়া পোড়া মাটির পাত্রের টুকরো দেখেই ওই সময়ের কথা জানতে পারা গেছে।



মাটির নকশা-করা পাত্র

চাকা দিয়ে শুধু মাটির পাত্র তৈরি হয় না। শস্য যখন পাওয়া গেল তখন শস্য পেষাই করারও দরকার হল। প্রথমে পাথরের উপরে পাথর ঠুকেই শস্য পেষা হত। আমাদের এখনকার শিলনোড়ার মতোই আর কী? তারপর দুখানা পাথরের চাকা দিয়ে তৈরি হল জাঁতা। এইভাবে চাকা খাবার তৈরির কাজটাও সহজ করে দিল।



চাকা

ক্রমে ক্রমে অনেক কাজেই চাকার ব্যবহার হয়েছে। চাকার উন্নতিও

হয়েছে। যেখানেই গতি দরকার, সেখানেই যোগানো হয়েছে চাকা। এখন তো দেখছিই—গাড়িতে, সাইকেলে, মোটরে, ট্রেনে, জাহাজে, উড়োজাহাজে, কলকারখানায়, যন্ত্রপাতিতে রয়েছে নানান ধরনের চাকা। সভ্যতা কিভাবে এগিয়েছে, তা চাকার বেশি-বেশি ব্যবহার দেখেই আমরা বুঝতে পারি। চাকা মানুষের জীবনকে গতিশীল করতে বিশেষ সাহায্য করেছে।

অনুশীলনী

১। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে লেখো ঃ
রোদে শুকোলে কাদামাটি (শক্ত/নরম) হয়।
চাকার উপর (পাথর/কাদামাটি) রেখে পাত্র তৈরি শুরু হল।
গাঁয়ের (কুমোররা/কামাররা) মাটির পাত্র তৈরি করেন।
দুখানা (মাটির/পাথরের) চাকা দিয়ে তৈরি হল জাঁতা।

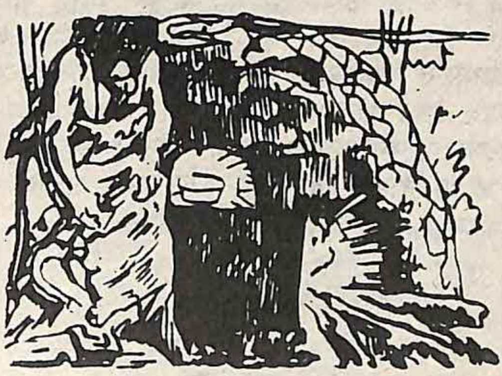
২। বলো দেখি ঃ
মাটির পাত্র প্রথমে কিজন্যে তৈরি হয়েছে?
শস্য পেষাই করা হয় কীসের সাহায্যে?
চাকা কী কী কাজে সাহায্য করছে?
কুমোররা কীভাবে মাটির পাত্র তৈরি করেন?

ধাতুর ব্যবহার

পোড়া মাটির হাঁড়ি-বাসন আমরা ব্যবহার করি বটে, কিন্তু একটুতেই ওগুলো ভেঙে যায়। তাই অ্যালুমিনিয়াম বা পিতলের হাঁড়ি, কাঁসা-পিতল বা এনামেলের থালা-বাসন, লোহা-অ্যালুমিনিয়ামের কড়াই—এসব ব্যবহার করি। এদের দাম বেশি। কিন্তু মাটির চেয়ে অনেক শক্ত। টেকেও অনেক দিন। পাথরের ছুরি-দা-এর চেয়ে লোহার ছুরি-দা অনেক বেশি ধারালো। আমরা জানি, এই অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, কাঁসা, লোহা—এগুলো ধাতু। মানুষ কখন এইসব ধাতুর কথা জানল?

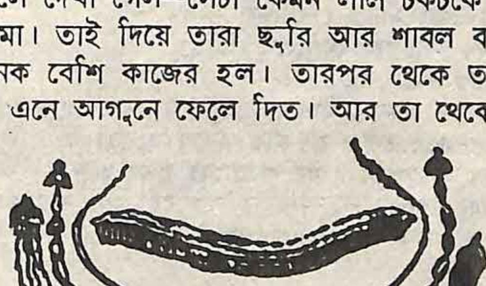
মাটির কিছু কিছু পাত্র তৈরি হল। বেশিরভাগ পাত্র, অস্ত্রশস্ত্র তো তখনকার মানুষ বানাত পাথর দিয়ে। তার জন্যে ভালো ভালো পাথর খুঁজত। একবার কিছু সবুজ পাথর পেল। তাকে ভাঙতে চেষ্টা

করল। কিন্তু খুব জোরে জোরে ঘা মেরেও তাকে ভাঙা গেল না। বরং তার আকার গেল বদলে। তারা বুঝল এটা আসলে পাথর নয়। তবু সেটাকে পিটিয়ে-পিটিয়েই কিছু জিনিস বানাল।



ধাতু গলানো হচ্ছে

ওরই একটা টুকরো হয়তো ছিটকে আগুনে পড়ে গিয়েছিল। আগুন নিভলে দেখা গেল—সেটা কেমন লাল চকচকে হয়ে গেছে। এটা হল তামা। তাই দিয়ে তারা ছুরি আর শাবল বানিয়ে নিল। এগুলো অনেক বেশি কাজের হল। তারপর থেকে তারা ওইরকম সবুজ পাথর এনে আগুনে ফেলে দিত। আর তা থেকে পেয়ে যেত



ব্রোন্‌জের অলংকার আর অস্ত্রশস্ত্র

তামা। তাই দিয়ে ছুরি, শাবল, বর্শা, তীর, বঁড়শি আর নানারকম পাত্র তৈরি করত। কিছু কিছু গয়নাও তারা বানাল। তামাই হল মানুষের ব্যবহারের প্রথম ধাতু।

এইভাবেই কখনও তামা-পাথরের সঙ্গে অন্য পাথর আগুনে ফেলেছিল। তা থেকে বের হল অন্য একটা ধাতু। সেটা তামার সঙ্গে মিশে গেল। তামাকে করল অনেক শক্ত, আর অনেক চকচকে। এটা হল ব্রোন্‌জ। মানুষ এখন আর-একটা নতুন ধাতু পেয়ে গেল। তাই দিয়ে অস্ত্রও হল, আবার কারিগররা গয়নাও তৈরি করল। আজও তো অনেক বাড়িতে মা-দিদিরা ব্রোন্‌জের চুড়ি-বালা পরেন। নানা দেশে অনেক খেলাধুলোয় ব্রোন্‌জের পদক দেওয়া হয়।

অনুশীলনী

১। বাক্যগুলি পুরো করে লেখোঃ

কাদামাটির চেয়ে শক্ত হল —। তার চেয়েও শক্ত —।

প্রথম ধাতু পাওয়া গিয়েছিল — থেকে।

ধাতুর মধ্যে প্রথমে মানুষ পেয়েছিল —।

তামার সঙ্গে অন্য ধাতু মিশলে তৈরি হয় —।

২। ঠিক শব্দটির নীচে দাগ দাওঃ

খুঁজতে-খুঁজতে একবার মানুষ কিছু (সবুজ/কালো) পাথর পেল।

আগুনে পোড়ালে তামার রঙ হল (সবুজ/লাল)।

(তামা/ব্রোন্‌জ) হল মানুষের ব্যবহারের প্রথম ধাতু।

ধাতু পাওয়ার আগে মানুষ (মাটির/পাথরের) অস্ত্র বানাত।

মাটির পাত্রের চেয়ে ধাতুর পাত্রের দাম (বেশি/কম)।

শিল্প-কারিগরি-লেখাপড়া

চাষ আর পশুপালন মানুষের খাবারের সমস্যা মিটিয়েছে। তাই মানুষ তখন অনেক সময় পেয়েছে। নানাদিকে বুদ্ধি খাটিয়েছে। গাছের আঁশ তুলে দড়ি পাকিয়েছে। সুতো তৈরি করেছে। তুলো দিয়েও সুতো হয়েছে। এমন-কী রেশমের সুতোও বের করেছে। পাথর বা কাঠের মাকু বানিয়েছে। তাঁত হয়েছে। তাঁতে কাপড় বুনেছে। সেই কাপড় দিয়ে পোশাক বানিয়েছে। মাটি পুড়িয়ে ইঁট তৈরি করেছে।



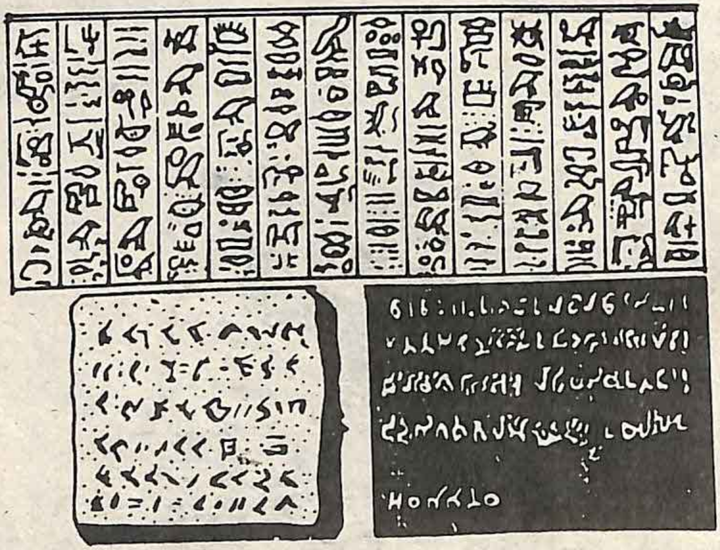
তাঁতে কাপড় বোনা

তখন তো মানুষ একসাথেই দল বেঁধে থাকে। গোটা দলের দরকারমতোই সব জিনিস তৈরি হয়। দলের নানা মানুষ নানা কাজ করেন। কাজ করতে-করতে অনেকে তাঁদের কাজগুলো আরও সুন্দর করতে লাগলেন। কাপড়, গয়না, অস্ত্রশস্ত্র, ঘরবাড়ি, গাড়ি, নৌকো— সবই সুন্দর হল।

এসময় আর মানুষ অঙগভঙিগ করে বা শব্দ করে কথা বলে না। এক-একটা শব্দ দিয়ে এক-একটা কথা বোঝায়। শব্দের পর শব্দ দিয়েই গড়ে উঠল ভাষা। কাজের মতো ভাষাও ধীরে ধীরে সুন্দর হল।

সামনে থাকলে তো কথা বলা যায়। কিন্তু দূরের মানুষকে কী করে মনের কথা জানাবে? ছবি আঁকতে-আঁকতে ছবির মতোই লিপি

তৈরি হল। তাও ক্রমশ সুন্দর হল। প্রথমে গাছের ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তার উপর লেখা হল। লেখাগুলো যাতে বেশিদিন থাকে তারও ব্যবস্থা হল। কাদামাটির ফলকে লিখে তাকে শুকিয়ে এবং পুড়িয়ে নেওয়া হল। পাথরের উপর খোদাই করেও লেখা হল।



প্রাচীন লিপি—উপরে মিশরীয় লিপি।
নীচে বাঁদিকে কিউনিফর্ম লিপি, ডান দিকে ব্রাহ্মী লিপি।

একসঙ্গে থাকাতে বেশ একটা সমাজ গড়ে উঠল। দরকারি নানা কাজ হতে লাগল। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে যখন অবসর পাওয়া যেত তখন নাচগানও হত। শিকারের যুগে বড়োরা ছেলেদের শিকারের কায়দা শিখিয়েছেন। তারপর যে যেমন পেরেছে, সে তেমন কাজ শিখেছে। নানা কাজের কারিগররা ছেলেদের কাজের কায়দা শিখিয়েছেন। লিপি আবিষ্কারের পর মানুষ লিখতে-পড়তে শিখেছে, লেখা পড়ে বুঝতেও শিখেছে।

অনুশীলনী

১। মোটা হরফের শব্দগুলি ঠিক করে লেখোঃ
চাষ আর পশুপালন মানুষের **কাজের** সমস্যা মিটিয়েছে।

তুলো দিয়েও রেশম হয়েছে।
কাজের মতো শব্দও ধীরে ধীরে সুন্দর হল।
প্রথমে গাছের গায়ের উপর লেখা হল।
একসঙ্গে থাকাতে বেশ একটা দল গড়ে উঠল।
লিপি আবিষ্কারের পর মানুষ পড়তে ও লিখতে শিখেছে।

২। শূন্যস্থানে ঠিকমতো শব্দ বসাওঃ
গাছের —— তুলে দড়ি পাকিয়েছে। —— পুড়িয়ে ইঁট বানিয়েছে। গোটা দলের —— সব জিনিস তৈরি হয়। শব্দের পর শব্দ দিয়েই গড়ে উঠল ——। ছবি আঁকতে আঁকতে ছবির মতোই —— তৈরি হল। একসঙ্গে থাকাতে বেশ একটা —— গড়ে উঠল।

৩। বলো দেখিঃ
মানুষের তৈরি জিনিসগুলি কেমন করে সুন্দর হল?
লিপি তৈরি হওয়ায় কী সুবিধা হল?
লেখাগুলো বেশিদিন থাকার জন্যে কী করা হল?
কখন মানুষ লিখতে-পড়তে শিখেছে?

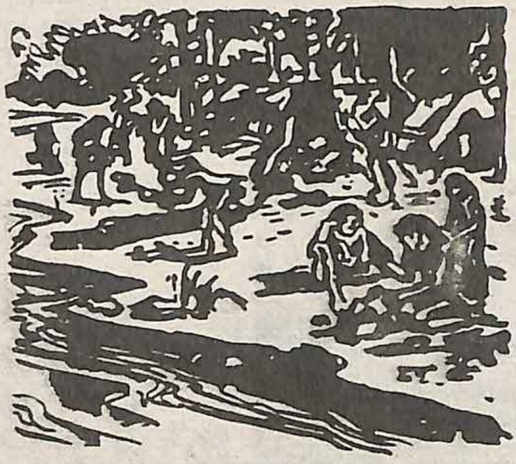
গোষ্ঠীজীবন

যদি কোনো অচেনা লোক আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন, তাহলে হয়তো বলব 'আমার নাম অমুক' বা 'আমি অমুক বাড়ির ছেলে।' আবার কখনও হয়তো পাড়ার নাম, কি গাঁয়ের নাম বা শহরের নাম বলব।

যে সময়ের কথা আমরা বলছি, সে সময়ে এখনকার মতো নামের সঙ্গে উপাধি থাকত না। গ্রামগুলো সবে গড়ে উঠেছে। সেসব গ্রামের নামও ছিল না। মানুষ বাস করত পৃথিবীর নানা জায়গায় দল বেঁধে। কখনও একদলের মানুষের সঙ্গে অন্যদলের মানুষের দেখা হয়ে যেত। তখন কী বলে পরিচয় দেবে? কিছু একটা ঠিক করা দরকার।

তাছাড়া, দলে লোক বাড়ছে। কাজও বাড়ছে। নানারকম কাজ হচ্ছে। একসঙ্গে থাকতে গেলে বা কাজ করতে গেলে সকলকেই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। কারও কথা শুনতে বা মানতে হয়। তাই দলের মধ্যে যে সবচেয়ে কাজের লোক বা শক্তি-সাহস যার বেশি, তেমন একজনের কথাই সবাই মানতে লাগল। এইভাবে দলের 'নেতা' তৈরি হল। মানুষের দলগুলো হল গোষ্ঠী, আর নেতার নামেই হল গোষ্ঠীর পরিচয়।

এর মধ্যে কিন্তু একটা বিরাট বদল হয়ে গেল। এর আগেও দলের একটা পরিচয় ছিল। সেটা ছিল মায়ের নামে। এক মায়ের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে এক জায়গায় থাকত। নানা কাজে শক্তি-সাহস দেখিয়ে ক্রমশ



এক গোষ্ঠীর মানুষ

পুরুষরা এগিয়ে এল। তাই ক্রমশ পুরুষই হল গোষ্ঠীর নেতা। যাই হোক, ধীরে ধীরে সুন্দর, নিয়মমানা একটা সমাজ গড়ে উঠল।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো:
আগের দিনে মানুষের নামের সঙ্গে —— থাকত না। মানুষ বাস করত —— নানা জায়গায় দলবেঁধে। একসঙ্গে থাকতে গেলে সকলকেই কিছু —— মেনে চলতে হয়। দলের মধ্যে সবচেয়ে কাজের লোকই হল দলের ——। নেতার —— হল গোষ্ঠীর পরিচয়।

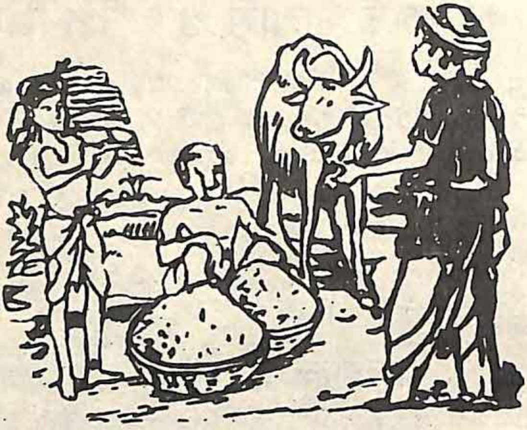
২। বলো দেখি:
আগের দিনে মানুষ কেমনভাবে থাকত? কে দলের নেতা হল? পুরুষ কীভাবে গোষ্ঠীর নেতা হল?

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দাসপ্রথা

তখন দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে কাজের অনেক ভাগ হয়ে গেছে। কেউ তৈরি করেন মাটির জিনিসপত্র, কেউ সুতো বা কাপড় বানান, কেউ পাথরের জিনিস গড়েন। কেউ গড়েন ধাতুর পাত্র, কেউ গয়না, আবার কেউ বা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করেন। আবার তেমনি কেউ চাকা, গাড়ি বা নৌকো বানিয়ে দেন। তবে বেশির-ভাগ লোকই করেন চাষের কাজ বা পশুপালন।

আগে গ্রামের প্রত্যেকেই ছিল সমান। প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্যে বা গ্রামের জন্যেই সব কাজ করত। যতই দিন যেতে লাগল, ততই কারিগররা তাদের তৈরি জিনিসপত্রের বদলে অন্য জিনিস আনতে আরম্ভ করল। কারিগর আর কৃষিজীবীদের মধ্যে একটা তফাত দেখা দিল। বদল করে অন্য জিনিস বেশি পাবার জন্যে কারিগররা বেশি-বেশি জিনিস তৈরি করল। বাড়তি তৈরি জিনিসের ভাগ সে আর কাউকে দিল না। ভাবল—সে যা তৈরি করেছে সেগুলো সবই তার। এইভাবে হল 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'। তৈরি জিনিস, কাজের যন্ত্রপাতি, এমনকি থাকার ঘরবাড়ি পর্যন্ত এক-একজনের নিজের সম্পত্তি হয়ে গেল। পালিত পশুগুলোও এইভাবে এক-একজনের হয়ে গেল। একমাত্র চাষের জমিই বহুদিন পর্যন্ত সমাজের সম্পত্তি হয়ে থাকল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়ার ফলে মানুষের জীবন আর সমাজের ধরনই পালটে গেল। কারিগররা বেশি জিনিস উৎপাদন করে 'লাভ' করতে শুরু করল।

তৈরি-করা বা দরকারী জিনিসের বদলাবদলি গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রথম শুরু হয়। তারপর এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর। এখন আমরা কোনো জিনিস দরকার হলে টাকা-পয়সা দিয়ে কিনে আনি। তখন তো তা হয় নি। মনে করো, তাঁতী খাবার জন্যে ধান বা গম কিনবেন। কিন্তু চাষীর তখন কাপড় দরকার নেই। কাপড় হয়তো দরকার কুমোরের। আবার তাঁতী হাঁড়ি কিনবেন না। তাহলে উপায় কী হবে? মানুষ তখন ভেবে একটা পথ বের করল। গোরু তো সবারই আছে। গোরু বেশি হলেও ক্ষতি নেই। তাই গোরুর বদলে জিনিস দেওয়া-নেওয়া শুরু হল। যেমন কুমোর চারখানা কাপড় নেওয়ার জন্যে তাঁতীকে একটা গোরু দিলেন। তাঁতী আবার সেই গোরুটা চাষীকে দিয়ে দু-ধামা ধান কিনলেন।

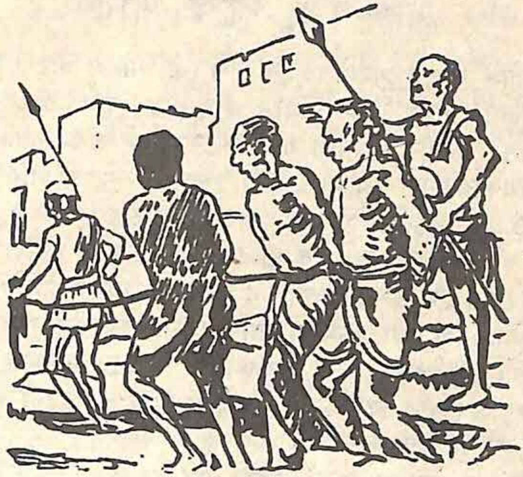


জিনিসের বদলে জিনিস দিয়ে কেনা-বেচা

গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে জিনিস দেওয়া-নেওয়া করতে গোরু নিয়ে যাওয়া অসুবিধে। তাই গোরুর বদলে এল 'কড়ি'। ক্রমশ কড়ির বদলে ধাতু, তারপর 'মুদ্রা' এল। তারপর দাঁড়িপাল্লা চালু হল। জিনিসপত্র কেনা-বেচার কাজে একদল লোক এগিয়ে এল। তারা হল 'বণিক'।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি, লাভ—এসব থেকেই সমাজে এল 'ধনী' আর 'গরিব'। যার যত সম্পত্তি সে তত ধনী। সম্পত্তি বাড়াতে এক গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করল। যারা হারল, তাদের সবকিছু অন্যেরা দখল করে নিল। হেরে-যাওয়া মানুষদের বন্দী করে নিয়ে এসে নিজেদের উৎপাদনের কাজে লাগল। এরা হল 'দাস'। এরা হল একেবারে নিঃস্ব। নিজের বলতে এদের কিছুই থাকল না। এদের যারা খাটাত, তারা হল 'মালিক'। ক্রমশ এই দাস-মালিকরা নিজেরা না খেটে দাসদের খাটুনির ফলে উৎপন্ন জিনিস বা ফসল ভোগ করতে লাগল।

সমাজ ধনী-গরিব, দাস-মালিক—এইভাবে ভাগ হয়ে গেল। ধনীরা, মালিকেরা, কারিগররা—গরিব বা দাসদের ঠকাতে লাগল। ঠিকমতো পাওনা তো দিতই না, তার উপর অত্যাচারও করত। তাই কখনও কখনও গরিব বা দাসরা এই অত্যাচার মেনে নিতে পারত না, বিদ্রোহ করত। তখন তাদের 'শাসন' করবার জন্যেই তৈরি করা হল



পরাজিত গোষ্ঠীর মানুষদের বেঁধে নিয়ে আসা হচ্ছে

'আইন' 'সিপাই', 'বিচারশালা'। দাসদের ছেলেদেরও দাস করেই রাখা হত।

দুঃখের কথা আজও পৃথিবীর অনেক দেশে এইসব জঘন্য ব্যবস্থা চলছে।

অনুশীলনী

১। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে লেখোঃ

আগে গ্রামের প্রত্যেকেই ছিল (সমান/অসমান)। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এল (কৃষিজীবী/কারিগর)দের কাছ হতে। কারিগররা (বেশি/কম) জিনিস উৎপাদন করে লাভ করতে শুরু করল। জিনিসের বদলাবদলি গোষ্ঠীর (মধ্যে/বাইরে) প্রথম শুরু হয়। প্রথমে (গোরুর/মুদ্রার) বদলে জিনিস দেওয়া-নেওয়া হত। যারা জিনিসপত্র কেনা-বেচা করত তারা হল (মালিক/বণিক)।

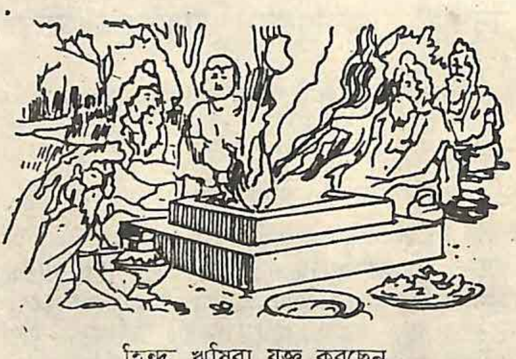
২। বলো দেখিঃ

আগে কারিগররা অন্য জিনিস পেত কী করে?
আমরা এখন কী দিয়ে জিনিস কিনি?
দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কী কাজ হয়?
সমাজে ধনী-গরিব হল কী থেকে?
দাস কাদের বলা হত?
আইন হল কেন?

যাগ-যজ্ঞ, পুজো-পার্বণ

বনে বাস করার সময় হিংস্র পশুকে মানুষ ভয় পেত। সমাজে বসবাস করবার সময় ঠিক তেমনি ঝড়, বাজ, বৃষ্টি মানুষকে অস্থির করে তোলে। আবার চাষবাস যখন শুরু হল, তখন রোদ-জল-বাতাস যে কত দরকারী তা বোঝা গেল। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যত নিবিড় হল, প্রকৃতিকে তারা ভয়ও পেল তত। তাই পুজো, প্রার্থনা, যাগ-যজ্ঞ, বলি দিয়ে প্রকৃতিকে তারা খুশি রাখতে চাইল। কারণ রোদ ঝড় বৃষ্টি কেন হয় এসব বিজ্ঞানের কথা তো মানুষ সেদিন বুঝত না। যাঁরা যাগ-যজ্ঞ পুজো প্রার্থনা পরিচালনা করতেন তাঁদের বলা হত পুরোহিত। প্রকৃতির রোষ থেকে তাঁরা মানুষকে বাঁচাতে পারেন এমন একটা বিশ্বাস তৈরি হয়ে উঠেছিল বলে সমাজে পুরোহিতদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে গেল।

মানুষ যে কেবল প্রকৃতিকেই ভয় পেল, তাই নয়। নানারকম



হিন্দু ঋষিরা যজ্ঞ করছেন

অসুখ-বিসুখ, অনিশ্চয়তাও তাদের মাঝে মাঝে কাতর করে তুলত। সেসময় ডাক্তার-বদ্যি ছিল না, ঔষধ-পথ্যও অজানা ছিল। তখন কিছু কিছু লোক ঝাড়ফুঁক তুকতাক করতে শুরু করল, এদের মধ্যে পুরোহিতরাও ছিলেন। কখনও কখনও এতে হয়তো ভালো কাজ হত। সাধারণ মানুষ তাই দেখে অবাক হয়ে যেত।

এবার পুরোহিতেরা মন দিলেন যাগ-যজ্ঞের নিয়মকানুন এবং মন্ত্রতন্ত্র তৈরিতে। রচিত হল পুঁথি। সেইসব পুঁথি থেকে তাঁরা ছোটোদের শেখাতেও শুরু করলেন। তাঁরাই হয়ে উঠলেন গুরুমশাই। এইভাবে ধীরে ধীরে সমাজের অনেক উঁচুতে তাঁরা তাঁদের জায়গা করে নিলেন। তাঁরাই হয়ে উঠলেন সমাজের মাথা অথবা সমাজকে যাঁরা শাসন করেন তাঁদের সাহায্যকারী।

অনুশীলনী

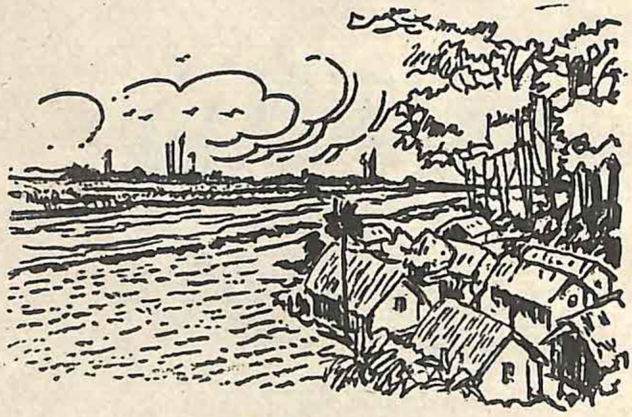
১। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় হল কী করে?
২। পুরোহিত কাদের বলা হত?
৩। কীভাবে পুরোহিতদের স্থান সমাজে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল?

নদী-উপত্যকার সভ্যতা

এখন শহরগুলিকেই আমরা বেশি উন্নত বলি, অনেক লোক বাস করে শহরে। তাই তাদের জন্যে নানা সুবিধের ব্যবস্থা হয়েছে। একটা মজার কথা কী—এই যে শহরগুলো, সবই হয়েছে একটা না একটা নদীর ধারে।

আগে তো মানুষ গ্রামে থাকত। গ্রামগুলোও গড়ে উঠেছিল কোনো-না-কোনো নদীর ধারে। কিছু কিছু কারিগরি কাজ বা ব্যবসা-বাণিজ্য হলেও চাষবাসই ছিল মানুষের প্রধান ভরসা। বেশি লোক চাষই করত। চাষের কাজ কোথায় ভালো হতে পারে? বড়ো বড়ো নদীর ধারে। নদীতে চাষের জন্যে বারোমাস প্রচুর জল পাওয়া যায়। নদীর পলিমাটি জমিকে উর্বর করে। তাই নদীর পাশে-পাশেই মানুষ নতুন বসতি গড়ে তুলল।

নদীর জলে কেবল চাষবাসই হয় নি। নদীপথে বাণিজ্যও হয়েছে। শত্রুর হাত থেকে নদী মানুষকে রক্ষা করেছে। নদীর পাড়ের বনে শিকারও মিলেছে। তাই নদীই ছিল ওইসব সভ্য মানুষের মায়ের



নদীর ধারে মানুষের বসতি

মতো। নদীর উপর নির্ভর করেই সভ্যতা উন্নত হয়েছে। নদীর ধারে নতুন নতুন শহর-বন্দর গড়ে উঠেছে।

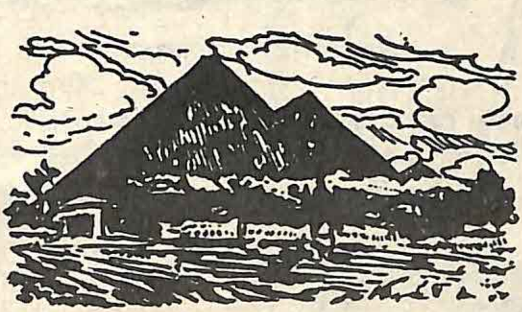
পৃথিবীর নানা জায়গায় এরকম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাদের কয়েকটার কথা বলি।

নদী-উপত্যকার সভ্যতা

আমাদের দেশ ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে ইরাক দেশ। তখন তার নাম ছিল মেসোপোটেমিয়া। এখানে টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল এক বিরাট সভ্যতা।

আরও পশ্চিমে হল মিশর দেশ। এটা আফ্রিকা মহাদেশে। এখানে নীলনদের ধারেও ছিল সুসভ্য মানুষের বাস। এদের নেতা (রাজা) বা তার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার গায়ে ওষুধমাখা কাপড় জড়িয়ে কবর দিত। এরকম ওষুধ-কাপড়-জড়ানো মৃতদেহকে বলে 'মমি'। কলকাতার জাদুঘরেও মমি এনে রাখা হয়েছে। মৃতের সঙ্গে তার প্রিয় জিনিসপত্রও কবরে দিত। তারপর কবরের উপর বানাত বিরাট পাথরের গম্বুজ—পিরামিড। এই পিরামিড আজও মানুষকে অবাক করে। মিশরের লোকেরাই প্রথম চাষের জন্যে নদী থেকে খাল কেটেছিল।

আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বদিকে চীন দেশ। এখানে আছে দুটো বড়ো বড়ো নদী—হোয়াংহো আর ইয়াংসিকিয়াং। এই নদী দুটোর



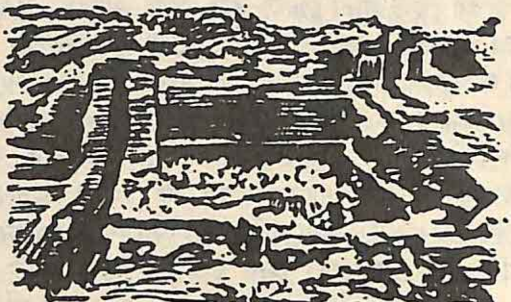
মিশরের পিরামিড

মাঝখানে গড়ে উঠেছিল ওইরকম সভ্যতা। এখানকার মানুষই প্রথম বন্যা আটকাবার জন্যে নদীতে বাঁধ দেন আর আটক-করা জলকে চাষের কাজে লাগান।

আমাদের দেশে উত্তর-পশ্চিম দিকে আছে সিন্ধুনদ। এর ধারে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাকে আমরা বলি সিন্ধু-সভ্যতা। পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে মানুষরা এখানে হরপ্পা আর মহেনজোদাড়ো নামে দুটো শহর গড়ে তুলেছিল।

অন্য জায়গার তুলনায় এখানকার সভ্যতা ছিল অনেক উন্নত। এ দুটো জায়গাই এখন পাকিস্তানের মধ্যে।

এতদিন আগেকার এত কথা কেমন করে জানা গেল। অন্য কাজ করতে গিয়ে মাটি খুড়ে ঐসব পুরানো বাড়িঘর, পথঘাট, কবরখানা এবং আরও নানা জিনিস পাওয়া গেছে। তার থেকেই সব কিছু জানা



মহেন্‌জোদাড়োর ভগ্নাবশেষ

গেছে। আমরাও তো আমাদের গ্রাম বা শহরের পুরানো দিনের কথা জানতে পারি—পুরানো গাছ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, বাড়ি—এইসব দেখে আর বয়স্ক মানুষদের কাছে তাঁদের কথা শুনে।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করে লেখোঃ

নদীর পলি চাষের জমিকে —— করে। নদী ছিল সভ্য মানুষের —— মতো। —— উপর নির্ভর করেই সভ্যতা উন্নত হয়েছে। আমাদের দেশের পশ্চিম দিকে —— দেশ। মিশর দেশে আছে —— নদ। ওষুধ-কাপড়-জড়ানো মৃতদেহকে বলে ——। ইয়াংসিকিয়াং —— দেশের একটি বড়ো নদী। আমাদের দেশে —— দিকে আছে সিন্ধু নদ। হরপ্পা শহর গড়ে উঠেছিল —— নদের ধারে।

২। এককথায় উত্তর দাওঃ

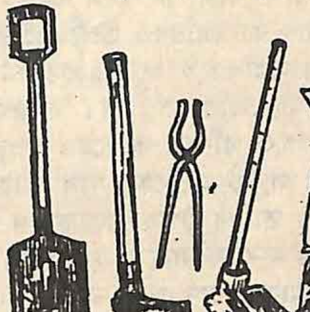
চাষের কাজ কোথায় ভালো হতে পারে? কোন্ দেশে চাষের জন্যে প্রথম খাল কাটা হয়েছিল? বন্যা আটকাবার জন্যে নদীতে বাঁধ দিয়েছিল কোন্ দেশে? ইরাক দেশের আগেকার নাম কী ছিল? মিশর দেশের কবরের উপর তৈরি পাথরের গম্বুজকে কী বলে? হরপ্পা-মহেন্‌জোদাড়োর সভ্যতাকে কী সভ্যতা বলা হয়? মহেন্‌জোদাড়ো এখন কোন্ দেশে?

লোহার কথা

মাটি খ‍ুঁড়ে প‍ুরানো যেসব সভ্যতার কথা জানা গেছে, সেখানে তামা আর ব্রোন্‌জ ছাড়া অন্য কোনো ধাতুর চিহ্ন পাওয়া যায় নি। কিন্তু তারও পরে সভ্যতা আরও এগিয়েছে। মান‍ুষ লোহা আবিষ্কার করেছে।

যাকে আমরা বলি 'তারা-খসা' আসলে সেটা 'উল্কা'। পৃথিবীতে খসে-পড়া সেই উল্কাপিণ্ড থেকেই মান‍ুষ প্রথম লোহা বের করেছে। তারপর মাটির তলা থেকে মাটিতে মেশানো লোহাও পেয়েছে মান‍ুষ। তখন লোহা দিয়েই অস্ত্র বানিয়েছে। লাঙল, কাস্তে, কাটারি (দা) তৈরি করেছে। পরে আরও অনেক কিছ‍ু বানিয়েছে। যেসব দেশ তাড়াতাড়ি লোহার ব্যবহার করতে পারল, সভ্যতার পথে অন্যদের চেয়ে তারাই এগিয়ে গেল।

আজ তো কলকারখানা, রেল, জাহাজ, কড়ি-বরগা, ট্রাক্টর-পাম্প, রান্নার কড়া-খ‍ুন্তি, জলের কল, এমনকি কাপড়-সেলাইয়ের বা ইনজেকশন দেবার স‍ূঁচ পর্যন্ত সব-কিছ‍ুতেই আমরা লোহা ব্যবহার করছি। আমরা কি ভাবতে পারি, প্রায় চার হাজার বছর আগে মান‍ুষের কত পরিশ্রমে এই লোহায‍ুগের সভ্যতা শ‍ুর‍ু হয়েছে।



লোহার জিনিস

অন‍ুশীলনী

১। প্রথম কী থেকে লোহা পাওয়া গেছে?
২। কতদিন আগে লোহার ব্যবহার শ‍ুর‍ু হয়েছে?
৩। তারা-খসা জিনিসটা আসলে কী?
৪। লোহার তৈরি পাঁচটা জিনিসের নাম করো।

পুরানো সভ্যতার দান

এই যে এত পুরানো দিনের কথা আমরা জানলাম, তা হল সভ্যতার আদিকথা—ইতিহাস। লক্ষ লক্ষ বছর আগে হয়েছে মানুষের সৃষ্টি। বাঁচার প্রয়োজনে সেই মানুষ হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। পাথর দিয়ে অস্ত্র বানিয়েছে। আগুনের ব্যবহার শিখেছে। পশুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগিয়েছে। খাদ্যসংগ্রহের বদলে সে নিজে খাদ্য ফলিয়েছে। কৃষিকাজ শিখেছে। গ্রাম তৈরি করে একসঙ্গে বাস করেছে। সমাজ গড়ে তুলেছে। বাণিজ্য করেছে। লিপি এবং ভাষা তৈরি করেছে। ছবি আঁকা, লেখাপড়া, নাচগান শিখেছে। ধাতুর ব্যবহার, মুদ্রার ব্যবহার শিখেছে। যুদ্ধ করেছে। আইনকানুন সৈন্য দিয়ে দেশ শাসন করেছে। শহর-বন্দর গড়ে তুলেছে।

এগুলো সবই সভ্যতার এক-একটা দিক। আমরা এখন এই সভ্যতার সুফল ভোগ করছি। সভ্যতার সবকিছুর পিছনেই আছে মানুষের বুদ্ধি আর শ্রম। বুদ্ধি খাটিয়ে শ্রমের সাহায্যে নিত্য-নতুন জিনিস বেশি-বেশি উৎপাদন করেই উন্নতি ঘটিয়েছে। ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান আর কারিগরিরও উন্নতি হয়েছে।

অবশ্য সবকিছুই সুখের হয় নি। আগে উৎপাদনে এবং ভোগে সকলের সমান অধিকার ছিল। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' হওয়ার পর একদল আর-একদলকে বঞ্চিত করেছে। সমাজে ধনী-গরিব সৃষ্টি হয়েছে। দাস-প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। দাস আর গরিবরা তাদের সব অধিকার হারিয়েছে। তাদের উপর অত্যাচারও হয়েছে অনেক।

আজও মানুষে মানুষে হানাহানি আছে। আজও মানুষ মানুষকে অত্যাচার আর শোষণ করে। আজও পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়।

কিন্তু পৃথিবীতে যদি শান্তি থাকে, যদি মানুষ মানুষকে অত্যাচার না করে, যদি সব মানুষ সমান সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারে তবে পৃথিবীটা কত সুন্দরই না হয়।

ভূগোল

ভূমিকা

তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস ও ভূগোলের নতুন বই 'সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ : প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হল।

এই খণ্ডে আলোচিত হয়েছে মানবসভ্যতার বিকাশের আদিপর্ব— শিকারবৃত্তি তথা ফল আহরণের অনিশ্চিত জীবনযাপন থেকে লৌহ-যুগে উত্তরণ।

বিকাশের মূল ধারাটিকে অনুসরণ করে, এক-এক যুগের প্রধান ঘটনাগুলিকে এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী সরল ভাষায়, গল্প বলার চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে রাজ্যের সকল জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের পরিচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের আশা, এই কাহিনী ছাত্রদের মনে যথার্থ ইতিহাসবোধ জাগিয়ে তুলবে ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে। একই সাথে সমগ্র মানবজাতির পার্থিব এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে তারা সন্ধানী তথা শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে।

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হল। বইখানিকে শিশুদের জন্য আরও আকর্ষণীয় ও অর্থবোধক করে তোলার জন্য পরামর্শও একান্তভাবে কামনা করি।

বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকার
নব-সচিবালয়, কলিকাতা

বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচীপত্র

গোড়ার কথা

প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের কথা কিছু কিছু শুনেছি, জেনেছি। এবার তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা ওই বিষয়টি দুটি আলাদা বিভাগে আরও ভালো করে পড়ব। ভূগোলে আমরা জানব প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা। আর ইতিহাসে জানব সামাজিক পরিবেশের কথা।

আমার বাড়িঘর, আর পাড়ার পরিবেশ সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা হয়েছে। আমার পাড়ার মধ্যে রাস্তাঘাট, খাবার জল, পুকুর, খেলার মাঠ, ক্লাব, পাঠাগার—এসব কোথায় আছে তা আমি জানি। বাড়ি থেকে স্কুলে কিংবা হাটবাজারে কোন্ রাস্তায় যাওয়া যায়, তা আমি জানি। ওইসব রাস্তাঘাটে আমি বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করতেও দেখি।

আবার, দূরের পরিবেশে গ্রাম, শহর, মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন, থানা, জেলা এবং আমাদের রাজ্য ও দেশের কথাও কিছু কিছু শুনেছি।

গ্রামের জমিতে কী কী ফসল হয়, গ্রামে আর কী কী ধরনের জিনিস তৈরি হয়, শহরের কল-কারখানায় কী কী উৎপন্ন হয়, গ্রাম বা শহরের উৎসব অনুষ্ঠান—এসব বিষয়েও আমরা জানি। শীতে গরমে আমরা কেমন পোশাক পরি, এবং কেন অমন পোশাক-আশাক পরি, তাও কতকটা বুঝতে পারি। আমাদের বাড়ি, বিদ্যালয়—এসব পরিবেশ কেমন করে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, তা শিখেছি।

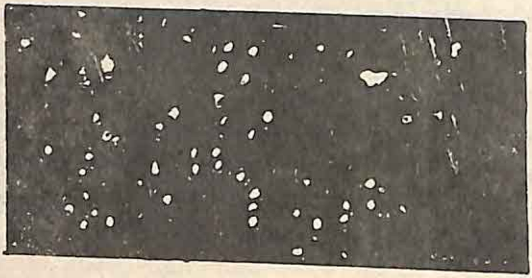
আমরা মাটিতে বাড়িঘর বানাই, রাস্তাঘাট তৈরি করি, কল-কারখানা গড়ি, চাষ-আবাদ করি। জল আমাদের জীবন। আমরা জল পাই মেঘ থেকে, নদী থেকে কিংবা মাটির তলা থেকে। আর আমাদের মাথার ওপরে আছে খোলা আকাশ। আকাশে দেখি সূর্য, চাঁদ, তারা, মেঘ—আরও কত কী। এই আকাশ বাতাস, মাটি, জল, গাছপালা—সব কিছু নিয়েই হল আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ।

'রইব না আর বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে'—এখন আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে, গ্রাম-শহর আর জেলার সীমানা পেরিয়ে, বাইরের বিশাল পৃথিবীকে, জগৎটাকে দেখব, ভালো করে জানব।

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশের উপর গ্রহ-নক্ষত্র, মেঘ-বৃষ্টি, দিন-রাত, ঋতু ইত্যাদির প্রভাব

মহাকাশ



রাতের আকাশ

নদীর ধারে বা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে দূরের আকাশটা দেখলে কী মনে হবে বলো তো? মনে হবে না কি—দূরে ওই অনেক দূরে আকাশটা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে? আকাশের সীমানাটা যেন শেষ হয়ে গেছে। আসলে কী জান—আমাদের পৃথিবীটা প্রায় গোল, আর শূন্যে ভেসে আছে। আমরা রয়েছি মস্ত বড়ো বলের মতো পৃথিবীর ওপরে ছড়িয়ে। তাই আমাদের মাথার ওপর চারদিকেই আকাশ বা শূন্য। আমরা লাফ দিয়ে একটু ওপরে উঠলেই বলতে পারি আমরা আকাশে উঠেছিলাম।

আকাশের যে শেষ কোথায় তা আমরা কেউ জানি না, আর ভাবতেও পারি না। দূরের আকাশকে বলা হয় মহাকাশ।

গ্রহ, নক্ষত্র

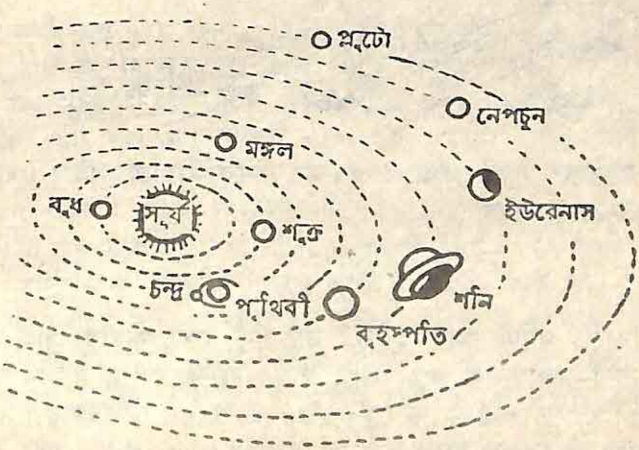
দিনেরবেলা এই অসীম মহাকাশে আমরা সূর্যকে দেখি—চারদিক সে আলোকিত করে রেখেছে। আর রাত্রিবেলা দেখি অসংখ্য নক্ষত্র আর চাঁদকে। নক্ষত্রকে আমরা বলি **তারা**। তারাগুলি আকাশে স্থির

হয়ে থাকে, চলাফেরা করে না। ওদের নিজস্ব আলো আছে। পৃথিবী থেকে অনেক দূরে আছে বলে ওদের আলো মিটমিট করে। আচ্ছা, আমরা তো শুকতারা দেখেছি। ওই যে সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। তখন আমরা একে বলি সাঁঝতারা। আবার ভোরবেলা শুকতারাকে পূব আকাশেও দেখা যায়। কেমন জ্বলজ্বল করে। মনে হয় আমাদের পৃথিবীর খুব কাছাকাছি রয়েছে। ওটা কিন্তু তারা নয়। ওটা একটি গ্রহ। আকাশে এরকম দশটি গ্রহ আছে।

তারাগুলোকে ঘিরে আছে গ্রহ। এরা তারার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। গ্রহদের নিজস্ব আলো নেই। এরা তারার আলোয় দূর থেকে জ্বলজ্বল করে। যেমন আমাদের পৃথিবী, সূর্য নামের নক্ষত্রের চারদিকে ঘুরছে—যেন সূর্যের সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা।

কোনো-কোনো গ্রহের আবার সাথী থাকে। যেমন আমাদের পৃথিবীর সাথী হল চাঁদ। এদের বলা হয় **উপগ্রহ**। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।

সূর্য পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের একটি নক্ষত্র। সূর্য থেকে আমরা আলো আর উত্তাপ পাই। সূর্যের জন্যই পৃথিবীতে মেঘ, বৃষ্টি, দিন, রাত, ঋতুপরিবর্তন ইত্যাদি হয়। পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, গাছপালা আর আমরা মানুষ—সবাই বেঁচে আছি সূর্যেরই জন্য।



মেঘ

গরমের দিনে বিকেলবেলা মাঝেমধ্যে কালবৈশাখীর ঝড় নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ। পরিষ্কার আকাশের এক কোনায় উঁকি দিল ছোট্ট একটা মেঘ। অল্প সময়ের মধ্যেই সারা আকাশটা ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ল। চারদিক অন্ধকার করে ধুলো উড়িয়ে এল দারুণ ঝড়। তার সঙ্গে সঙ্গে নামল জোর বৃষ্টি। বর্ষার মেঘও দেখেছ তোমরা। আকাশে যেন মেঘ আর রোদের লুকোচুরি খেলা। ছাইরঙের ঘন মেঘে ঢেকে আছে পুরো আকাশ। তারপর বৃষ্টি। পুজোর সময় শরৎকালের আকাশের মেঘও দেখেছ তোমরা। কী সুন্দর পেঁজা তুলোর মতো। আচ্ছা, বলো তো, এই মেঘ কেমন করে হয়? শোনো তা হলে। সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে ওপরে ওঠে। তারপর ছোটো-ছোটো ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলকণায় পরিণত হয়। আকাশে ভাসমান অতি ছোটো-ছোটো জলকণার সমষ্টিই হল **মেঘ**। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আকাশে অনেক রকম মেঘ দেখা যায়। সাধারণত বাদল-মেঘেই বৃষ্টি হয়।



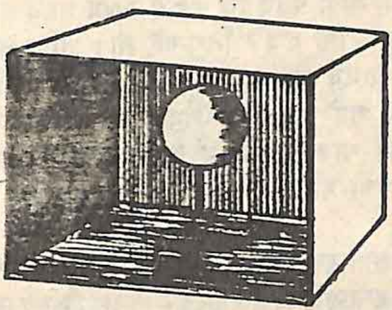
মেঘের আড়ালে সূর্য থাকলে গরমের দিনে আরাম লাগে, আবার শীতকালে ঠান্ডা লাগে।

বৃষ্টি

বর্ষাকালে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। মাঠ-ঘাট, খেত-খামার, খাল-বিল, পুকুর, নদী-নালা—সব জলে ভরে যায়। জোর কদমে চাষের কাজ শুরু হয়। বলতে পার বৃষ্টি কেন হয়? আকাশের মেঘ আরও ঠান্ডা হলে মেঘের ভেতরকার জলকণাগুলি একটির সঙ্গে আর-একটি মিশে

আরও বড়ো হয় এবং তারা ভারী হয়ে ওঠে বলে আর আকাশে ভেসে থাকতে পারে না। মাটিতে ঝরে পড়ে। একেই বলে **বৃষ্টি**। বৃষ্টি আমাদের খুব উপকার করে। বৃষ্টির ওপর চাষ-আবাদ নির্ভর করে। ধান, পাট, শাক-সবজি প্রভৃতি ফসল ফলে। তাই বৃষ্টি খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে। বৃষ্টির জল যাতে সহজে গড়িয়ে যেতে পারে সেই জন্য গ্রামাঞ্চলে বাড়িঘরের টিন, খড় বা খোলার চাল ঢালু থাকে যাতে জল সহজে গড়িয়ে যেতে পারে। পাকা বাড়িতে পাইপ বসিয়ে দেওয়া হয়।

প্রাণী-কুল উদ্ভিদের জন্যই বেঁচে থাকে। কাজেই জীবের জন্ম আর বংশবিস্তারে বৃষ্টি খুবই সাহায্য করে। ভেবে দেখো তো বৃষ্টি না হলে আমাদের কী অবস্থা হত?



দিন-রাত

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সূর্যকে কোন্ দিকে দেখ? পূব দিকে, তাই না? দুপুরবেলা সূর্য থাকে মাথার ওপর। আর বিকেল-বেলা খেলাধুলো করে তুমি যখন বাড়ি ফের, সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। রোজই এমন হয়। আচ্ছা বলতে পার, কেন এমন হয়? আসলে পৃথিবী লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছে বলে এমন হয়। অবিরাম এরকম পাক খাওয়ার ফলে ফুটবলের মতো গোলাকার পৃথিবীর যে অর্ধেক অংশ সূর্যের আলো পায় তখন সেখানে হয় **দিন**। কিন্তু এর বিপরীত অংশে সূর্যের আলো পড়ে না। সেখানে তখন অন্ধকার। তাই সেখানে হয় **রাত**। পৃথিবীর সম্পূর্ণ একবার পাক খেতে যে সময় লাগে তাকে আমরা বলি পুরো **একদিন** বা ২৪ ঘণ্টা। মোটামুটিভাবে ১২ ঘণ্টায় দিন ও ১২ ঘণ্টায় রাত ধরা হয়।

দিনে আলো আর উত্তাপ পাওয়া যায় বলেই দিনটা গরম। আর রাতে আলো নেই তাই অন্ধকার, এবং উত্তাপ না থাকার জন্য ঠাণ্ডা। কাজেই দিনে আর রাতে আলো আর তাপের পার্থক্য ঘটে। এই পার্থক্য যদি না থাকত তাহলে কোনো জায়গায় বেশি উত্তাপের জন্য বা বেশি ঠাণ্ডার জন্য সবই নষ্ট হয়ে যেত। দিনে আমরা কাজকর্ম করি, আর রাতে নিই বিশ্রাম। দিন-রাত না থাকলে সব কেমন ওলট-পালট হয়ে যেত।

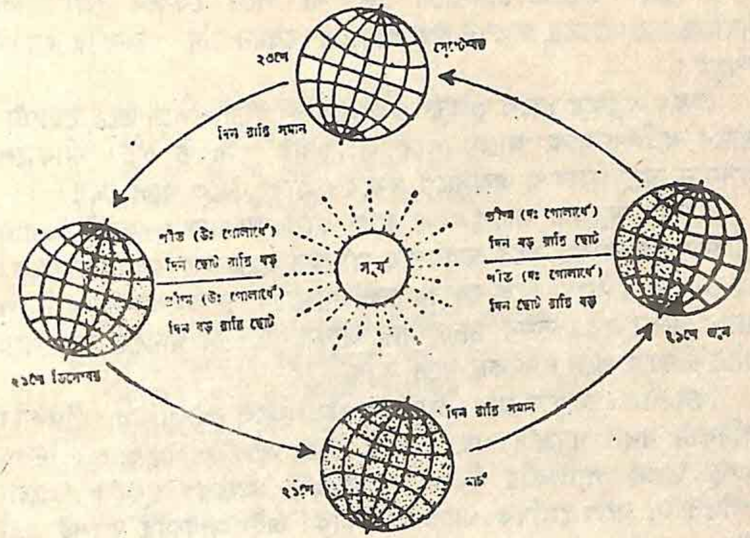
ঋতু

আচ্ছা বলো তো, সারা বছর কি একই রকম গরম বা ঠাণ্ডা থাকে? সারা বছর ধরেই কি বৃষ্টি হয়? নিশ্চয়ই না। প্রতি বছর পালা করে গরম, ঠাণ্ডা, বৃষ্টি—এসব আসে আর যায়। আমরা দেখি—এক সময়ে ধান হয়, এক সময়ে পাট হয়, এক সময়ে গম হয়। আবার এক-এক সময়ে এক-এক রকম শাক-সবজি, ফুল-ফল দেখতে পাই। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদে দেখা যায় কত পরিবর্তন। এগুলি সবই হয় ঋতু-পরিবর্তনের জন্য।

লাট্টুর পাক-খাওয়া তোমরা দেখেছ। লাট্টু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাক খায় না। পাক খেতে-খেতে ঘোরে। পৃথিবীও প্রায় তেমনি পাক খেতে-খেতে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে। সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে এক বছর। প্রায় ৩৬৫ দিনে **হয় এক বছর**। পাক খেতে-খেতে এভাবে সূর্যের চারদিকে ঘোরার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শীত আর গরমের তফাত হয়। ঠাণ্ডা-গরম-বৃষ্টি এসবের পার্থক্যের জন্য বছরকে কতগুলি অংশে ভাগ করা হয়। এর প্রত্যেকটি ভাগকে বলা হয় এক-একটি **ঋতু**।

আমাদের রাজ্যে ঋতুর বড়ো বৈচিত্র্য দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের ৬টি ঋতুর কথা তো তোমরা জান—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত আর বসন্ত। তবে এদের মধ্যে হেমন্ত আর বসন্ত খুবই সামান্য কটি দিন থাকে। কাজেই এই রাজ্যে চারটি প্রধান ঋতু দেখা যায়। তারা হল **গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ আর শীত**।

ঋতুপরিবর্তনের ফলে জল-হাওয়ার খুব পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল, শাক-সবজি, ফুল-ফল হয়। মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদের তফাত হয়—সারা বছর ধরে আমরা একই রকম পোশাক



পরে থাকি না। গরমের সময় হালকা ঢিলে-ঢালা সূতির পোশাক আর শীতকালে একটু বেশি জামা-কাপড়, গরম জামা এসব পরি।

ভৌগোলিক শব্দভাণ্ডার

মহাকাশঃ পৃথিবী আকাশে ভাসছে। পৃথিবীর চারপাশেই আকাশ। এই আকাশের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তাই একে বলে মহাকাশ।

নক্ষত্রঃ মহাকাশে স্থির-হয়ে-থাকা অসংখ্য মিটমিট-করা আলোর বিন্দুগুলিই হল নক্ষত্র বা তারা। এদের নিজেদের আলো আছে। এদের আকারও বিরাট। বহু দূরে-দূরে থাকার জন্য ওদের অত ছোটো দেখায়।

গ্রহঃ সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট পথ ধরে যারা অবিরাম ঘুরছে তাদের বলে গ্রহ। এদের নিজেদের আলো নেই। সূর্যের আলোয় এরা আলোকিত হয়।

উপগ্রহ: গ্রহের চারপাশে নির্দিষ্ট পথে যে-সব জ্যোতিষ্ক নিয়মিতভাবে ঘোরে, তাদের উপগ্রহ বলে। যেমন চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ।

মেঘ: সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠের জল বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে, ছোটো-ছোটো ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলকণায় পরিণত হয়। আকাশে ভাসমান বহু জলকণা একসাথে সমবেত হলে তাকে বলে মেঘ।

বৃষ্টি: সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে আকাশের ছোটো-ছোটো ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলকণায় পরিণত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। এই মেঘ খুব ঠান্ডা হলে মেঘের জলকণাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে আরও বড়ো হয়। তখন তারা আর আকাশে ভেসে থাকতে না পেরে মাটিতে ঝরে পড়ে। একেই বলে বৃষ্টি।

দিন-রাত: লাট্টুর মতো পাক খাওয়ার ফলে গোলাকার পৃথিবীর যেদিকটা যখন সূর্যের আলো পায়, সেই অর্ধেক অংশে হয় দিন। কিন্তু তখন পৃথিবীর বিপরীত অর্ধেক অংশে সূর্যের আলো পৌঁছয় না বলে সেদিক থাকে অন্ধকার। এই অন্ধকার অংশই হল রাত।

ঋতু: হেলে-থাকা পৃথিবী লাট্টুর মতো পাক খেতে-খেতে একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাপের পার্থক্য ঘটে। ঠান্ডা-গরম-বৃষ্টি ইত্যাদির পার্থক্যের জন্য বছরকে কতগুলি অংশে ভাগ করা হয়। এক-একটি ভাগকে বলা হয় এক-এক ঋতু। আমাদের রাজ্যে চারটি প্রধান ঋতু দেখা যায়। যথা—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত।

অনুশীলনী

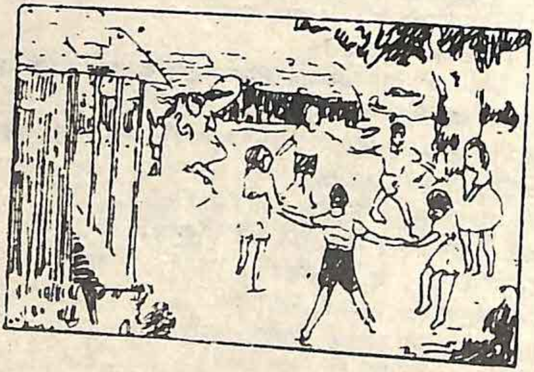
অল্প কথায় নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ

১। মহাকাশে কী কী দেখা যায়?
২। নক্ষত্রের আলো মিটমিট করে কেন?
৩। শুকতারাকে কখন কোথায় দেখা যায়?
৪। নক্ষত্র কাকে বলে?
৫। গ্রহ কাকে বলে?
৬। উপগ্রহ কাকে বলে?
৭। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রটির নাম কী?
৮। সূর্য আমাদের কী উপকার করে?
৯। কালবৈশাখীর ঝড় কখন দেখা যায়?
১০। শরৎকালের মেঘ কেমন দেখতে?
১১। মেঘ কেমন করে হয়?
১২। কী রকম মেঘে বৃষ্টি হয়?
১৩। বৃষ্টি কী করে হয়?
১৪। বৃষ্টি আমাদের কী উপকার করে?
১৫। দিন-রাত কী করে হয়?
১৬। পৃথিবীর সম্পূর্ণ একবার পাক খেতে কতক্ষণ সময় লাগে?
১৭। দিনে গরম আর রাতে ঠাণ্ডা হয় কেন?
১৮। সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর কত সময় লাগে?
১৯। ঋতুর পরিবর্তন হয় কেন?
২০। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ঋতু কটি? কী কী?
২১। ঋতু-পরিবর্তনের ফলে কী কী পরিবর্তন দেখা যায়?
২২। কোন্‌টি কী? সঠিক উত্তরটির তলায় দাগ দাওঃ
(ক) সূর্য (গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ)
(খ) শুকতারা (নক্ষত্র, উপগ্রহ, গ্রহ)
(গ) পৃথিবী (উপগ্রহ, গ্রহ, নক্ষত্র)
(ঘ) চন্দ্র (গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র)

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ—পরিবেশকে সুস্থ এবং সুন্দর রাখার জন্য মানুষের করণীয়—অপরিচ্ছন্নতার কুফল

পরিবেশ বলতে বোঝায় আমাদের চার পাশের সব কিছুকেই। গাছপালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, মানুষ আর আলো, হাওয়া, জল, মাটি, শব্দ—এ সমস্ত কিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে—প্রকৃতির সব জিনিসই একটি আর-একটির ওপর নির্ভর করে থাকে। আবার দেখো, তোমার বাড়িঘর, স্কুল, পাড়া—এসব নিয়েও তোমার পরিবেশ। আর তুমিও তো পরিবেশেরই অঙ্গ। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন পরিবেশ হলে শরীর আর মন ভালো থাকে। কাজেই পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা,



সুস্থ রাখা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলা, নোংরা করা ঠিক নয়। ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা দরকার। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। খেয়াল রাখবে তোমার কোনো কাজের জন্য যেন অপরের কোনো অসুবিধা না হয়। অন্যের কোনো রকম অসুবিধা সৃষ্টি না করাই হল সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ। কাজেই আমাদের আচার-আচরণ ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই আমরা আমাদের পরিবেশ গড়ি। পরিবেশের একটি জিনিস

আর-একটির উপর প্রভাব ফেলে। এবার আমাদের পরিবেশের কয়েকটি জিনিস নিয়ে আমরা একটু ভেবে দেখি, কী বল?

গাছপালা

গাছপালা থাকলে চারপাশ কেমন সবুজ থাকে। গাছে-গাছে কত পাখি, ফুল, ফল। কেমন সুন্দর পরিবেশ। গাছপালা থাকলে জায়গাটা বেশ ঠান্ডা থাকে, বৃষ্টি হয়, বাতাস বিশুদ্ধ থাকে। গাছপালা না থাকলে মাটি খুব ক্ষয়ে যায়, নদীতে বন্যা হয়। বন্যায় কত ক্ষয়ক্ষতি হয় আমাদের। গাছপালার অভাবে আবার খরা দেখা দেয়। তোমরা তো জান, খরায় নদী-নালা, চাষের জমি সবকিছু শুকিয়ে যায়। গাছপালা মাটিতে বৃষ্টির জল ধরে রাখে। মাটিকে ঠান্ডা রাখে। তাহলে



দেখো, গাছপালা আমাদের কত উপকার করে। কাজেই মানুষের করণীয় হল গাছপালা লাগানো। তোমরাও মনে রাখবে, একটি গাছ কাটতে হলে পাঁচটি গাছ লাগাতে হবে। গাছপালা না থাকলে আমরা বাঁচতে পারি না।

জল

জল আমাদের জীবন। পান করা থেকে শুরু করে, বাড়ির কাজকর্ম, চাষ-আবাদ প্রভৃতি সব কাজেই প্রচুর জল লাগে। কিন্তু

ভেবে দেখেছ কী—জল কীভাবে দূষিত হচ্ছে? বাড়িঘরের নোংরা জল, কল-কারখানার বিষাক্ত জল—এসব গিয়ে পড়ছে পুকুর, খাল-বিল, নদী-নালাতে। ফলে জল দূষিত হচ্ছে। দূষিত জলে উদ্ভিদ আর প্রাণী বাঁচতে পারে না। কাজেই জলকে বিশুদ্ধ রাখা দরকার।

মাটি

গাছপালা কেটে ফেলার ফলে মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে। তাই বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টির জন্য মাটিও ক্ষয়ে যাচ্ছে। মাটি নষ্ট হচ্ছে। ফলে খরা হচ্ছে, বন্যা দেখা দিচ্ছে। চাষেরও ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই মাটির পরিবেশের দিকেও নজর দেওয়া দরকার। ভূমিক্ষয় বন্ধ করা প্রয়োজন। মাটির ক্ষয় রোধ করার জন্য দরকার গাছ লাগানো, এবং গাছ-কাটা বন্ধ করা।

বাতাস

শীতকালে বিকেলের দিকে তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে—মাটির কিছু ওপরে বিরাট এলাকা জুড়ে একটা সাদা আস্তরণ পড়েছে। ওটা হল ধোঁয়ার আস্তরণ। ক্রমে ওই ধোঁয়া চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে ধুলো-ময়লার সঙ্গে মিশে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। বাতাস দূষিত হয়ে যায়। ওইরকম বাতাসে আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। নানারকম রোগও হয়। গাছপালারও ক্ষতি হয়। বিশুদ্ধ বাতাস তো আমাদের জীবন। অথচ আমাদের চারপাশের বাড়িঘরের উনুনের ধোঁয়া, কল-কারখানার ধোঁয়া, যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া প্রভৃতি বায়ুকে দূষিত করে চলেছে। কাজেই ধোঁয়া যাতে কম হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং ধোঁয়া যাতে অনেক ওপরের বাতাসে মেশে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শব্দ

শান্ত, কোলাহলহীন পরিবেশই তো ভালো লাগে। আর হই-হট্টগোল, চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে থাকতে নিশ্চয়ই ভালো লাগে না।

কিন্তু আজকাল আমাদের পরিবেশ কেমন কোলাহলপূর্ণ হয়ে উঠছে। কল-কারখানার শব্দ, যানবাহনের আওয়াজ, গাড়ির হর্নের তীব্র শব্দ, লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি, মাইকের কানফাটানো আওয়াজ, বাজি-পটকার শব্দ, টিভি, রেডিও, ভিডিও, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদির আওয়াজে পরিবেশে শব্দ-দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে। শব্দ-দূষণ বর্তমান কালের এক সমস্যা। এর ফলে মানুষের শরীর, মন খারাপ হয়ে পড়ছে। নানারকম অসুখ-বিসুখ বাড়ছে। কাজেই শব্দ কমাতে হবে ঘরে-বাইরে সব জায়গায়। তোমরাও অকারণে বেশি রকম চিৎকার-চেঁচামেচি করবে না। শব্দ যাতে বেশি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবে।

তাহলে দেখলে তো—আমাদের চারপাশের পরিবেশ কেমন করে দূষিত হচ্ছে। কাজেই পরিবেশ-দূষণ কমাতে হবে। পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে তুলতে হবে।

ভৌগোলিক শব্দভান্ডার

পরিবেশ-দূষণঃ আমাদের চারপাশের পরিবেশের জল, মাটি, বাতাস ইত্যাদি দূষিত হয়ে পড়াকে বলে পরিবেশ-দূষণ।

অনুশীলনী

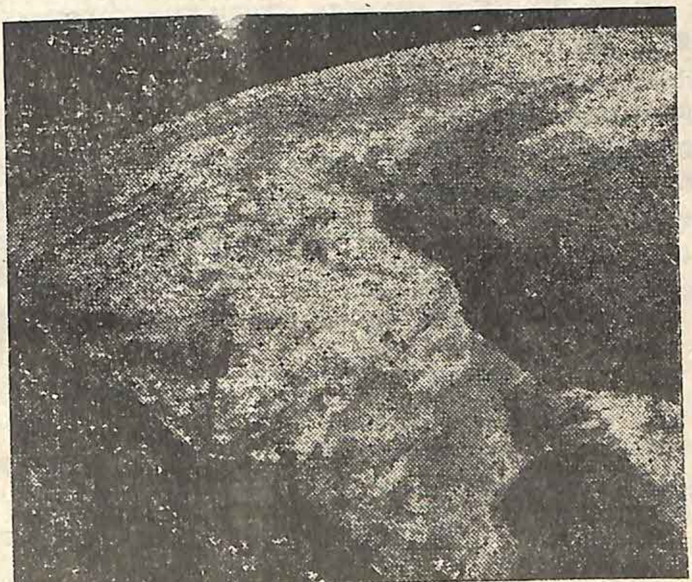
অল্প কথায় নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

১। পরিবেশ বলতে কী বোঝায়?
২। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আমাদের কী উপকার করে?
৩। গাছপালা আমাদের কী উপকার করে?
৪। গাছ কেটে ফেললে আমাদের কী কী ক্ষতি হয়?
৫। জল আমাদের কী কাজে লাগে?
৬। জল কীভাবে দূষিত হচ্ছে?
৭। ধোঁয়াশা কাকে বলে?
৮। বাতাস কীভাবে দূষিত হচ্ছে?
৯। মাটি কীভাবে নষ্ট হয়?
১০। ভূমিক্ষয় বন্ধ করা যায় কীভাবে?
১১। বায়ু-দূষণ কমানো যায় কীভাবে?
১২। শব্দ-দূষণ কীভাবে হয়?
১৩। অতিরিক্ত শব্দ আমাদের কী ক্ষতি করে?
১৪। তোমার বাড়ির পরিবেশকে কীভাবে পরিচ্ছন্ন রাখবে?
১৫। বিদ্যালয়-পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে তুমি কী করবে?

তৃতীয় অধ্যায়

জেলা, রাজ্য, দেশ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা

মহাকাশ থেকে আমাদের পৃথিবীকে দেখতে প্রায় একটা গোল বলের মতো। মহাকাশ থেকে তোলা পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন ছবি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পৃথিবীর ওপরে রয়েছে স্থলভাগ, আর তার চেয়েও বেশি জায়গায় আছে জলভাগ। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের এবং দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগের পরিমাণ বেশি। বড়ো-বড়ো স্থলভাগকে এক-একটি মহাদেশ আর বড়ো-বড়ো জলভাগগুলিকে এক-একটি মহাসাগর বলে। আমরা মানুষজন বাস করি স্থলভাগে—অর্থাৎ মহাদেশগুলির ওপর।



তোমরা, আমরা সবাই থাকি বাড়িতে, তাই না? এইরকম কাছাকাছি বেশ কিছু বাড়ি নিয়ে হয় একটি পাড়া। কয়েকটি পাড়া নিয়ে হয় একটি গ্রাম। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক-একটি ব্লক। কয়েকটি ব্লক নিয়ে হয় একটি মহকুমা। এরকম কয়েকটি মহকুমা নিয়ে এক-একটি জেলা গড়ে তোলা হয়। কয়েকটি জেলা নিয়ে হয় একটি রাজ্য। এমন অনেক রাজ্য নিয়ে হয় একটি দেশ। অনেকগুলি দেশ নিয়ে হয় একটি মহাদেশ। পৃথিবীতে এরকম মহাদেশ আছে সাতটি। মহাদেশগুলির নাম হল—এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আন্টার্কটিকা। আর মহাসাগর আছে পাঁচটি। যথা—প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর সাগর ও দক্ষিণ সাগর।

আমাদের দেশের নাম **ভারত**। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে ভারত অবস্থিত। মহাকাশ থেকে তোলা ভারতের ছবি দেখতে ভারি সুন্দর। ভারতের দক্ষিণ অংশ সমুদ্র দিয়ে ঘেরা আর উত্তরে রয়েছে চিরতুষারে ঢাকা হিমালয় পর্বত।

ভারতে অনেকগুলি রাজ্য আছে। তাদের মধ্যে **পশ্চিমবঙ্গ** একটি রাজ্য। আমরা বাস করি এই পশ্চিমবঙ্গে। হিমালয় পর্বত পশ্চিমবঙ্গের মাথার ওপর মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছে। আর তার চরণতল ধুয়ে দিচ্ছে সমুদ্র। আমাদের রাজ্যের চার পাশে কোন্ দিকে কোন্ কোন্ রাজ্য আর দেশ রয়েছে একটু জেনে নেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে আছে সিকিম রাজ্য ও ভুটান রাষ্ট্র। জেনে রাখো রাষ্ট্র মানেই দেশ। পূর্বে আসাম রাজ্য ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র। পশ্চিমে নেপাল রাষ্ট্র, বিহার ও ওড়িশা রাজ্য। আর একেবারে দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর।

এই রাজ্যে জেলার সংখ্যা মোট ১৭টি। উত্তর থেকে জেলাগুলির নাম—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ (বা মালদা), মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪-পরগনা ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা। তোমরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন জেলায় বাস কর। হয়তো কেউ থাক জলপাইগুড়িতে, কেউবা



বীরভূমে, আবার কেউবা হয়তো মেদিনীপুরে। এইরকম সব বিভিন্ন জেলায়। এর পর তোমরা জেলাগুলি সম্পর্কে আরও কথা জানতে পারবে।

ভূগোল

অনুশীলনী

১। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ
(ক) পৃথিবীতে কটি মহাদেশ আছে? মহাদেশগুলির নাম করো।
(খ) পৃথিবীতে কটি মহাসাগর আছে? মহাসাগরগুলির নাম করো।
(গ) তুমি কোন্ মহাদেশে বাস কর?
(ঘ) ভারত এশিয়া মহাদেশের কোন্ দিকে অবস্থিত?
(ঙ) পশ্চিমবঙ্গের চারদিকে কোন্ কোন্ রাজ্য এবং দেশ রয়েছে?
(চ) পশ্চিমবঙ্গে মোট কটি জেলা আছে?
(ছ) তুমি কোন্ জেলায় বাস কর?

২। শূন্যস্থান পূরণ করোঃ
(ক) কয়েকটি পাড়া নিয়ে হয় একটি ——।
(খ) অনেক —— নিয়ে হয় একটি দেশ।
(গ) অনেকগুলি দেশ নিয়ে হয় একটি ——।
(ঘ) কয়েকটি ব্লক নিয়ে হয় একটি ——।

৩। জেলা, রাজ্য, দেশ, মহাদেশ ও মহাসাগরের মধ্যে কোন্‌টি কী?
(ক) মেদিনীপুর, (খ) নেপাল, (গ) আফ্রিকা, (ঘ) আটলান্টিক, (ঙ) পশ্চিমবঙ্গ।

চতুর্থ অধ্যায়

জেলার অবস্থান—প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ও খনিজ দ্রব্য, অধিবাসী ও জীবিকা



১। দার্জিলিঙ জেলা

হিমালয়ের দক্ষিণের কোলে, পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উত্তরে রয়েছে এই জেলা। এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। বনে শাল, পাইন, জারুল, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মায়। দার্জিলিঙের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চা। এখানকার চা পৃথিবীবিখ্যাত। কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ধান, আলু, ভুট্টা, বিভিন্ন শাক-সবজি, মশলাপাতি প্রভৃতি হয়। এখানে প্রচুর কমলালেবুর ফলন হয়। খনিজ সম্পদের মধ্যে সামান্য পরিমাণ চুনাপাথর, কয়লা, ডলোমাইট, তামা প্রভৃতি পাওয়া যায়। গোর্খা, বাঙালি, ভুটিয়া, তিব্বতি, লেপচা প্রভৃতি জাতির মানুষেরা এখানে বাস করেন। অধিবাসীদের জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ করা, চা, কাঠ ও পর্যটনশিল্পে নিযুক্ত থাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়।



২। জলপাইগুড়ি জেলা

দার্জিলিঙ জেলা আর ভুটানের দক্ষিণে রয়েছে জলপাইগুড়ি

জেলা। এই জেলাতেও প্রচুর বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, পাট, তামাক, চা, কমলালেবু প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ করার। খনিজ সম্পদের মধ্যে এখানে চুনাপাথর পাওয়া যায়। অধিবাসীদের মধ্যে মূল বাঙলা ভাষা-ভাষী মানুষের সংখ্যাই অধিক। গোর্খা, রাভা, মেচ, ওরাওঁ, সাঁওতাল, গারো, টোটো প্রভৃতি উপজাতিভুক্ত মানুষের বাসও এই জেলায় আছে। চাষের কাজ, চা-বাগান ও কমলা-বাগানের কাজ, কাঠচেরাই, ব্যবসা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি প্রভৃতির সাহায্যে এই জেলার অধিবাসীরা জীবিকানির্বাহ করেন।



৩। কোচবিহার জেলা

জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণে এই জেলাটি অবস্থিত। কোচবিহারের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান, পাট এবং তামাক। অধিবাসীরা প্রধানত বাঙালি। জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, বিভিন্ন কুটিরশিল্পের কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়।



৪। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা

দার্জিলিঙ জেলার দক্ষিণে আর মালদহ জেলার উত্তরে রয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর জেলাটি। কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধান, পাট, সরিষা

প্রভৃতি এই জেলায় উৎপন্ন হয়। অধিবাসীরা বেশির ভাগ বাঙালি। এ ছাড়া সাঁওতাল আর কিছুসংখ্যক বিহারীর বাস আছে এই জেলায়। অধিবাসীদের জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য আর চাকুরি প্রধান।



৫। মালদহ জেলা

মালদহ জেলা চলতি কথায় মালদা জেলা নামেও পরিচিত। পশ্চিম দিনাজপুরের দক্ষিণে রয়েছে এই জেলা। কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধান, পাট, গম, বার্লি, ডাল প্রভৃতি এই জেলায় উৎপন্ন হয়। মালদার ফজলি আম খুবই বিখ্যাত। প্রচুর আমের ফলন হয় এই জেলায়। রেশমের কাপড় তৈরির জন্য মালদার বেশ নাম আছে। অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালিরাই প্রধান। এ ছাড়া কিছু বিহারী ও সাঁওতালের বাস এই জেলায়। অধিবাসীদের জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, চাকুরি ও ব্যবসা প্রধান। প্রাচীন বাঙলার রাজধানী গৌড় ছিল এই জেলাতেই।



৬। মুর্শিদাবাদ জেলা

অনেকটা নাশপাতি আকারের এই জেলাটি মালদহ জেলা আর

গঙ্গা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। ধান পাট, গম আর ডাল এই জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই জেলায় প্রচুর ভালো জাতের আমের ফলন হয়। এই জেলার রেশমের কাপড় খুব বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদের কাঁসার বাসনও বেশ নামকরা। হাতির দাঁতের আর শোলার কাজের জন্য এই জেলা পৃথিবীবিখ্যাত। অধিবাসীরা প্রধানত বাঙালি। কিছু বিহারীও বাস করেন এই জেলায়। চাষ-আবাদ, রেশমি কাপড় বোনা, কাঁসার বাসন, হাতির দাঁত আর শোলার কাজ, চাকুরি, ব্যবসা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদের মানুষ জীবিকানির্বাহ করেন।



৭। নদীয়া জেলা

ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে এবং মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে এই জেলাটির অবস্থান। নদীয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান। এ ছাড়া, পাট, আখ, ডাল, সরিষা প্রভৃতির ভালো ফলন হয়। এই জেলার মৃৎশিল্প আর তাঁতশিল্প খুবই বিখ্যাত। প্রধানত বাঙালিদের বাস এই জেলায়। জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, চাকুরি, ব্যবসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রাম পলাশি এই জেলাতেই অবস্থিত।

৮। বীরভূম জেলা

এই জেলা রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমে। বীরভূমের কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম, আখ, বার্লি, ডাল, সরষে প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ করার মতো। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে অল্প পরিমাণে চুনাপাথর আর কয়লা পাওয়া যায়। বীরভূম জেলায় চিনি তৈরির কল আছে। অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালিরাই প্রধান। এ ছাড়া, অন্যান্য রাজ্যের কিছু মানুষও বাস করেন এই জেলায়। অধিবাসীদের প্রধান জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ,

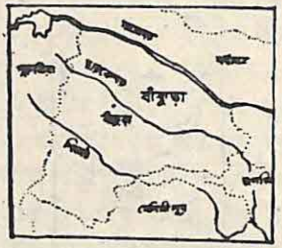


চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এই জেলাতেই অবস্থিত। ময়ূরাক্ষীর বাঁধ এই জেলাতেই রয়েছে।



৯। বর্ধমান জেলা

পূব-পশ্চিমে লম্বা এই জেলাটির অবস্থান বীরভূমের দক্ষিণে। বর্ধমান জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ধান। এ ছাড়া, পাট, আখ, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লা, চিনেমাটি আর অল্প পরিমাণে লোহা পাওয়া যায়। এই জেলা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্যও বিখ্যাত। লোহা-ইস্পাত, রেল-ইঞ্জিন, বিদ্যুতের তার, কাগজ, ছুরি-কাঁচি, চশমার কাঁচ, খনি-যন্ত্রপাতি, অ্যালুমিনিয়াম, সাইকেল, বস্ত্র -প্রভৃতি এই জেলায় উৎপন্ন হয়। অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালিরাই প্রধান। বিহারের কিছু মানুষ বাস করেন এই জেলায়। উপজাতির মধ্যে বহু সাঁওতাল বাস করেন এই জেলায়। অধিবাসীদের জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, ব্যবসা, চাকুরি, কল-কারখানা, খনিতে কাজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নদীতে বড়ো-বড়ো বাঁধ দিয়ে এত ভালো সেচের ব্যবস্থা আর কোনো জেলাতে নেই।



১০। বাঁকুড়া জেলা

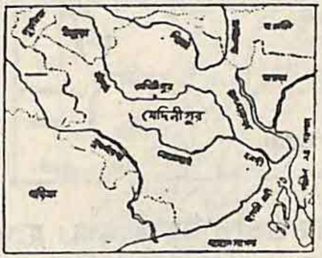
বর্ধমান জেলার দক্ষিণে এই জেলা অবস্থিত। বাঁকুড়ার প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য ধান। এ ছাড়া, গম, আলু, আখ প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়। বাঁকুড়া জেলার মৃৎশিল্প (টেরাকোটা) বিখ্যাত। এই জেলায় সিল্কের শাড়ি তৈরি হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, অভ্র, উলফ্রাম প্রভৃতি পাওয়া যায়। অধিবাসীরা প্রধানত বাঙালি। এ ছাড়া সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির বাস এই জেলায়। অধিবাসীদের জীবিকার মধ্যে চাষের কাজ, খনিতে কাজ, চাকুরি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।



১১। পুরুলিয়া জেলা

প্রায় ত্রিভুজ আকারের এই জেলাটির অবস্থান বাঁকুড়ার পশ্চিমে। এই জেলার বনজ সম্পদের মধ্যে শাল, পিয়াল, শিমুল, কুসুম, পলাশ, বাবলা, মহুয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রধান ফসল ধান আর গম। এ ছাড়া ভুট্টা, আখ, তৈলবীজ, প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। মাদুর আর পেতলের বাসন তৈরির জন্য এই জেলার নাম আছে। অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালিরাই প্রধান। এ ছাড়া বিহারী, এবং সাঁওতাল, কোঁড়া,

মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির বাস। জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, খনিতে কাজ করা, বাসন, মাদুর ইত্যাদি তৈরি করা, চাকুরি, ব্যবসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই জেলার অযোধ্যা পাহাড় বিখ্যাত।



১২। মেদিনীপুর জেলা

মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো জেলা। রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাঁকুড়ার দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের তীরে এই জেলাটি অবস্থিত। মেদিনীপুরে শাল, মহুয়া, কুসুম, পলাশ, শিরীষ, পিয়াশাল প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। কাজুবাদাম, তাল আর নারকেল গাছও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধান প্রধান। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি প্রচুর হয়। মেদিনীপুরের মাদুর বিখ্যাত। সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। এই জেলায় অনেক কল-কারখানাও আছে। অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালিরাই প্রধান। তা ছাড়া, ওড়িয়া, দক্ষিণ ভারতের কিছু মানুষ এবং সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি উপজাতির বাস এই জেলায়। চাষ-আবাদ, ব্যবসা, মাদুর বোনা, কল-কারখানায় কাজ, চাকুরি প্রভৃতি এই জেলার অধিবাসীদের জীবিকা। এখানে দীঘার সমুদ্রের ধারে বহু লোক বেড়াতে যান। এই জেলাতে তমলুক প্রাচীন বন্দর ছিল, কিন্তু এখন সমুদ্র অনেক দূরে সরে গেছে।

১৩। হুগলি জেলা

হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে এবং বর্ধমান জেলার দক্ষিণে এই জেলা অবস্থিত। প্রধান ফসল ধান। এ ছাড়া পাট, গম, আখ, সরিষা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই জেলায় প্রচুর শাক-সবজি আর ফলের চাষ

হয়। ফলের মধ্যে কলা, আম, লিচু, কাঁঠাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে পাটজাত দ্রব্য, রাসায়নিক পদার্থ, লোহার বিভিন্ন



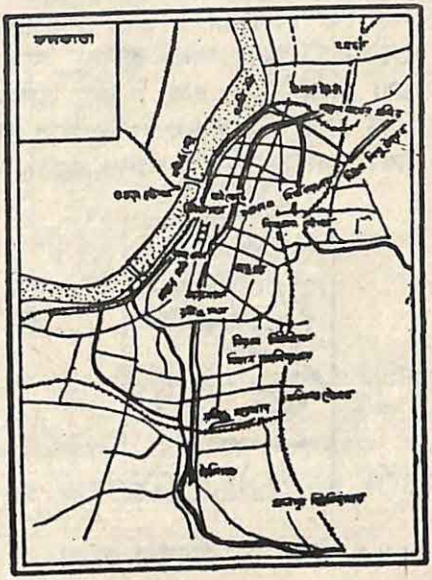
জিনিস, রবারের টায়ার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হুগলি জেলায় প্রধানত বাঙালিরাই বাস করেন। এ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের মানুষও থাকেন এখানে। জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, কল-কারখানায় কাজ, চাকুরি, ব্যবসা প্রভৃতি প্রধান।



১৪। হাওড়া জেলা

হুগলি জেলার দক্ষিণে, হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে হাওড়া জেলা অবস্থিত। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান, পাট, শাক-সবজি, আখ, ডাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই জেলা পানচাষের জন্য বিখ্যাত। নানারকম ফলও হয় এই জেলায়। হাওড়াতে অনেক কল-কারখানা আছে। এইসব কারখানায় নানান ইঞ্জিনীয়ারিং জিনিস, অ্যালুমিনিয়াম দ্রব্য, প্লাস্টিক, রঙ, সার, রাসায়নিক পদার্থ, বস্ত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই জেলা পাটজাত দ্রব্য তৈরির জন্যও বিখ্যাত। অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালিরাই প্রধান। এ ছাড়া বিহারী, ওড়িয়া, মাদ্রাজি, সাঁওতাল প্রভৃতি মানুষেরও বাস এই জেলায়। অধিবাসীদের জীবিকার মধ্যে

চাষ-আবাদ, চাকুরি, ব্যবসা, কল-কারখানায় কাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হাওড়ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন বিশ্ববিখ্যাত উদ্যান।



১৫। কলকাতা জেলা

রাজ্যের সবচেয়ে ছোটো জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা —হুগলি নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। পৃথিবীর জনবহুল শহরগুলির মধ্যে কলকাতা অন্যতম। তাই কলকাতাকে বলা হয় মহানগর। এক সময় কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা, রাজনীতি প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল এই কলকাতা। কলকাতায় একটি জাহাজ বন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে। বাঙালি ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের অনেক মানুষ বাস করেন এখানে। পৃথিবীর বহু দেশের মানুষও স্থায়ীভাবে এই মহানগরে বসবাস করেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করা ছাড়াও আশেপাশের বিভিন্ন জেলার বহু মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে কলকাতায় যাতায়াত করেন। বিভিন্ন কল-কারখানায় কাজ, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে

চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে কলকাতার অধিবাসীরা জীবিকানির্বাহ করেন। ভারতের একমাত্র মেট্রোরেল (পাতাল রেল) কলকাতাতেই রয়েছে। কলকাতায় অসংখ্য দর্শনীয় এবং বিখ্যাত জিনিস আছে—তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় গ্রন্থাগার, চিড়িয়াখানা, ইডেন গার্ডেন, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, রবীন্দ্র সরোবর, নেতাজী স্টেডিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, বিড়লা তারামণ্ডল, শিল্প-সংগ্রহশালা, গড়ের মাঠ, ফোর্ট উইলিয়াম, খিদিরপুর ডক, বিধানসভা, রাজভবন, আকাশবাণী ভবন, দূরদর্শন কেন্দ্র—আরও কত কী।



১৬। উত্তর ২৪-পরগনা জেলা

২৪-পরগনা একটি জেলা ছিল। কিছুদিন আগে এই জেলাকে উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগ করে দুটি জেলা করা হয়েছে। হুগলি নদীর পূর্ব তীরে নদীয়া জেলার দক্ষিণে রয়েছে এই জেলা। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, পাট, ডাল, ইক্ষু, শাক-সবজি উল্লেখযোগ্য। প্রচুর ফল-ফলাদি হয় এই জেলায়। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে চটজাত জিনিস, কাগজ, বস্ত্র, ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখ করার মতো। অধিবাসীরা প্রধানত বাঙালি। অন্যান্য রাজ্যের লোকজনও বাস করেন এই জেলায়। চাষ-আবাদ, কল-কারখানায় কাজ, চাকুরি, ব্যবসা প্রভৃতি এই জেলার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা।

১৭। দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলা

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে হুগলি নদীর পূর্ব তীরে রয়েছে এই জেলাটি। এই জেলার প্রধান

উৎপন্ন দ্রব্য ধান, পাট, বিভিন্ন শাক-সবজি প্রভৃতি। প্রচুর নারকেল গাছ জন্মায় এখানে। বনজ সম্পদের মধ্যে কাঠ, মধু, মোম এসব পাওয়া যায়। নদী ও সমুদ্রে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। শিল্পজাত দ্রব্যের



মধ্যে চটজাত দ্রব্য, জুতো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অধিবাসীরা সবাই প্রায় বাঙালি। চাকুরি, ব্যবসা, চাষ-আবাদ প্রভৃতি এই জেলার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। এ ছাড়া মৎস্যশিকার, কাঠ-মধু-মোম ইত্যাদি বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে বিপদসঙ্কুল জীবিকায় নিযুক্ত আছেন বহু মানুষ।

ভৌগোলিক শব্দভাণ্ডার

বনজ সম্পদ: বন থেকে যেসব দরকারি জিনিস পাওয়া যায় তাদের বলা হয় বনজ সম্পদ। যেমন—কাঠ, মধু, মোম, শালপাতা, হোগলা, গোলপাতা প্রভৃতি।

কৃষিজ সম্পদ: চাষ করে যে-সমস্ত জিনিস উৎপন্ন করা হয় তাদের বলা হয় কৃষিজ সম্পদ। যেমন—ধান, গম, চা, আখ, আলু ইত্যাদি।

খনিজ সম্পদ: মাটির নীচে খনি থেকে যেসব প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়, তাদের বলা হয় খনিজ সম্পদ। যেমন—কয়লা, চুনাপাথর, অভ্র ইত্যাদি।

শিল্পদ্রব্য: কল-কারখানায় যেসব দ্রব্য তৈরি করা হয় তাদের বলে শিল্পদ্রব্য। যেমন—ছুরি, কাঁচি, সাইকেল, রবারের টায়ার, পাটজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

আদিবাসীঃ কোনো অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের বলা হয় আদিবাসী।

উপজাতিঃ আদিম অধিবাসীদের বড়ো দলের মধ্যে ছোটো ছোটো ভাগের লোকদের বলা হয় উপজাতি। যেমন—মেচ, গারো, টোটো, রাভা প্রভৃতি।

জীবিকাঃ জীবনধারণের জন্য যে পেশা গ্রহণ করা হয় তাকে জীবিকা বলে। যেমন—চাকুরি, ব্যবসা, চাষ-আবাদ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। নীচের জেলাগুলিতে কী কী খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়?
(ক) দার্জিলিঙ, (খ) বীরভূম, (গ) বর্ধমান, (ঘ) পুরুলিয়া।

২। নীচের জেলাগুলির প্রধান কৃষিজ সম্পদ কী কী?
(ক) জলপাইগুড়ি, (খ) মুর্শিদাবাদ, (গ) বর্ধমান, (ঘ) হুগলি, (ঙ) নদীয়া, (চ) পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। নীচের জেলাগুলিতে কী কী শিল্পজাত দ্রব্য পাওয়া যায়?
(ক) বর্ধমান, (খ) হুগলি, (গ) হাওড়া, (ঘ) উত্তর ২৪-পরগনা।

৪। নীচের জেলাগুলির অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কী কী?
(ক) দার্জিলিঙ, (খ) মালদহ, (গ) দক্ষিণ ২৪-পরগনা, (ঘ) কলকাতা, (ঙ) জলপাইগুড়ি, (চ) পুরুলিয়া।

৫। সংক্ষেপে উত্তর দাও:
(ক) মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন বন্দরের নাম কী?
(খ) প্রাচীন বাঙলার রাজধানী 'গৌড়' কোন্ জেলায় অবস্থিত?
(গ) পানের চাষ বেশি হয় কোন্ জেলায়?
(ঘ) কোন্ জেলার অধিবাসীদের একটি জীবিকা কাঠ, মধু ও মোম সংগ্রহ করা?
(ঙ) কোন্ জেলার আকৃতি অনেকটা নাশপাতির মতন?
(চ) তুমি যে জেলায় বাস কর—তার সীমানা বলো।
(ছ) দার্জিলিঙ, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪-পরগনা পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অংশে অবস্থিত?

৬। নীচে কয়েকটি উপজাতির নাম দেওয়া আছে। এ'রা কোন্ জেলার অধিবাসী তা বলো।
(ক) বোধা, (খ) মেচ, (গ) লেপচা, (ঘ) মুণ্ডা।

৭। কোথায় উৎপন্ন হয় তা বন্ধনীর ভেতর থেকে বার করো।
(ক) চা (দার্জিলিঙ, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া)
(খ) কমলালেবু (মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, নদীয়া)
(গ) পাট (হুগলি, কলকাতা, দার্জিলিঙ)
(ঘ) তামাক (হাওড়া, পুরুলিয়া, কোচবিহার)
(ঙ) কাজুবাদাম (বীরভূম, হুগলি, মেদিনীপুর)
(চ) ফজলি আম (মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর)
(ছ) গম (কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিঙ)।

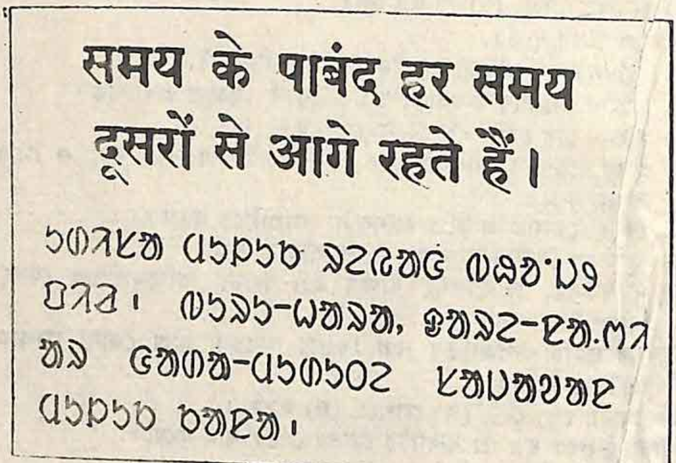
৮। কোন্ জেলার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা তা বলো।
(ক) পর্যটনশিল্প, (খ) কাঁসার বাসন তৈরি, (গ) হাতির দাঁতের কাজ, (ঘ) মাদুর বোনা, (ঙ) রেশমের কাপড় বোনা, (চ) কাঠচেরাই, (ছ) মৎস্য-শিকার, (জ) কমলালেবুর বাগানের কাজ।

পঞ্চম অধ্যায়

জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়—ভাষা, পোশাক, উৎসব-অনুষ্ঠান

ভাষা

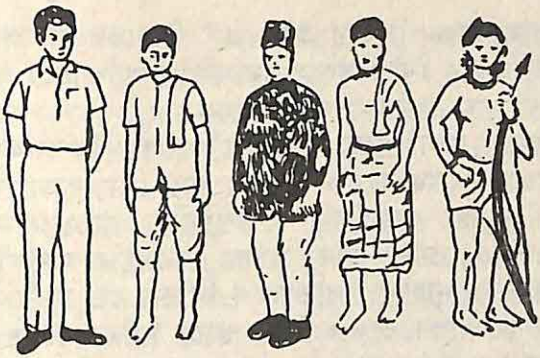
আচ্ছা বলো তো, পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ মানুষ কোন্ ভাষায় কথা বলেন? হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছ, বাঙলা ভাষায়। তবে ভাষা বাঙলা হলেও এক-এক অঞ্চলের মানুষের কথা বলার ধরন এক-এক রকমের। বইয়ের ভাষার সঙ্গে সব সময় তার মিল থাকে না। জলপাইগুড়ির বাঙলার সঙ্গে নদীয়ার বাঙলা বা পুরুলিয়ার বাঙলার সঙ্গে দক্ষিণ



২৪-পরগনার বাঙলা কথা বলার মধ্যে বেশ তফাত দেখা যায়। তোমরা তো জেনেছ, এই রাজ্যে বাঙালি ছাড়াও অনেক উপজাতির বাস। তা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের বহু মানুষও এ রাজ্যে বাস করেন। তাঁদের সবারই নিজেদের ভাষা আছে। কাজেই বাঙলা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের ভাষাও প্রচলিত। তবে বাঙলা ভাষার চলনটাই বেশি। অন্যান্য ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি, গোর্খালি, সাঁওতালি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পোশাক

জল-হাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের পোশাক-



পরিচ্ছদের কী রকম পরিবর্তন হয় তা তো তোমরা জান। দার্জিলিঙ পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা শীতের জন্য একটু বেশি পোশাক-পরিচ্ছদ পরেন। পশমের পোশাক গায়ে চাপাতে হয়। পায়ে মোজা আর মাথায় টুপি দেন। পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ রঙিন হয়। কিন্তু সমতল অঞ্চলের মানুষজন গরম আর ঘামের জন্য বেশি পোশাক পরেন না। সুতির হালকা ঢিলে-ঢালা পোশাকই তাঁদের পছন্দ। তবে শীতকালে কিছু গরম জামা-কাপড়ের দরকার হয়, কিন্তু তা পার্বত্য অঞ্চলের মতো নয়। সমতল অঞ্চলে মেয়েরা সাধারণত ফ্রক, স্কার্ট, শাড়ি—এসব ব্যবহার করেন। তবে আজকাল চলাফেরার সুবিধার জন্য শহরাঞ্চলে শালোয়ার, কামিজ, চুড়িদার প্রভৃতির চলও বেড়েছে। ছেলেরা বেশির ভাগ প্যান্ট, গেঞ্জি, ধুতি, শার্ট, লুঙ্গি, গামছা, পাজামা, ফতুয়া, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ব্যবহার করেন। তবে শহর ও শহরতলিতে আজকাল ধুতির ব্যবহার কমে এসেছে। বেশিরভাগ মানুষই প্যান্ট, শার্ট পরেন। বাঙালি ছাড়া যেসব আদিবাসী ও ভিন্ রাজ্যের মানুষ এ রাজ্যে বাস করেন তাঁদের অনেকের নিজস্ব পোশাক-আশাক আছে। উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রত্যেকেই আমরা আমাদের নিজস্ব পোশাক পরতে ভালোবাসি।

উৎসব-অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গের অনেক উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা তো তোমরা জান। কথায় বলে 'আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ।' কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। উৎসব-অনুষ্ঠান মানেই মিলন। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে আমরা

সকলে সকলের সঙ্গে মিলিত হই। এই মিলনের আনন্দ সবাই সমানভাবে ভাগ করে নিই। সকলে মিলেমিশে খুশি হয়ে কাজকর্ম করি। আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকে না।

দুর্গাপুজো, কালীপুজো, সরস্বতীপুজো, বিশ্বকর্মাপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো—এরকম অনেক পুজোর কথা তো তোমাদের জানা আছে। ঈদ, মহরম, বড়োদিন, বুদ্ধপূর্ণিমা, গুডফ্রাইডে—এসব অনুষ্ঠানের কথাও তোমরা জান। আবার রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দোল, রাখীপূর্ণিমা, নবান্ন, নববর্ষ, পৌষপার্বণ, বিভিন্ন ব্রত প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠান আমরা পালন করে থাকি। বছরের বিভিন্ন সময়ে এইসব উৎসব রাজ্যের প্রায় সর্বত্র পালন করা হয়ে থাকে। এগুলি হল রাজ্যের সাধারণ উৎসব-অনুষ্ঠান।

কাজেই ভাষা, পোশাক, উৎসব-অনুষ্ঠান—এসব বিষয়ে সারা রাজ্যেই একটা সাধারণ মিল আছে। বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন পোশাক, আলাদা-আলাদা উৎসব-অনুষ্ঠান—এমন দেখা যায় না। তবে অঞ্চলবিশেষে এসব বিষয়ে সামান্য কিছু পার্থক্য বা নতুনত্ব থাকতে পারে। এসো, এবার আমরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার উৎসব-অনুষ্ঠানের বিশেষ দিকগুলি জেনে নিই।

দার্জিলিঙ জেলাঃ সাধারণ উৎসব ছাড়া এই জেলার বিশেষ উৎসব ভাইটীকা, সর্পপঞ্চমী প্রভৃতি।

জলপাইগুড়ি জেলাঃ রাজবাড়ির মনসাপুজো, শিবরাত্রিতে জল্পেশ্বরের মেলা।

কোচবিহার জেলাঃ ভাওয়াইয়া গান, রাস উৎসব।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলাঃ ইসলামপুরের মেলা, নাজিরপুরের মেলা, পতিরামপুরের মেলা।

মালদহ জেলাঃ জহুরাতলা-পান্ডুয়া মেলা, গাজন, রামকেলি মেলা।

মুর্শিদাবাদ জেলাঃ বেরা উৎসব।

নদীয়া জেলাঃ শান্তিপুর আর নবদ্বীপের রাসমেলা, মায়াপুরের রথযাত্রা, চাকদার সাপের মেলা।

বীরভূম জেলাঃ শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, কেন্দুলির জয়দেবের মেলা, নানুরের বাউলমেলা।

বর্ধমান জেলাঃ পীর বাহারামের মেলা, চামুণ্ডাপূজার মেলা, ধর্মঠাকুরের মেলা আর গাজনের মেলা. শিবের গাজনের মেলা।

বাঁকুড়া জেলাঃ টুসুর মেলা, মনসাপূজার মেলা।

পুরুলিয়া জেলাঃ ভাদু উৎসব, ছো-নাচ, সাঁওতালদের বাদনা পরব প্রভৃতি।

মেদিনীপুর জেলাঃ স্বয়চণ্ডীর মেলা, উরস উৎসব, মহিষাদলের রথযাত্রা, বিজয়াদশমীতে রঘুনাথবাড়ির রথযাত্রা আর মেলা।

হুগলি জেলাঃ মাহেশের রথযাত্রা, ফুরফুরার উরস উৎসব, তারকেশ্বরের শিবরাত্রির মেলা, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি।

হাওড়া জেলাঃ উরস মেলা, গিয়াসউদ্দীন সাহেবের মেলা, মেলাই-চণ্ডীর মেলা, মাকড়চণ্ডীর পঞ্চমদোল মেলা, সোমাইচণ্ডীর মেলা, সিংহবাহিনীর মেলা, ভীম একাদশীর মেলা, রামরাজাতলার মেলা, হাওড়া ময়দানের রথের মেলা।

কলকাতা জেলাঃ রথের মেলা, বইমেলা, রাসমেলা, চর্মশিল্প-বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্পমেলা, বঙ্গসংস্কৃতি মেলা, চড়কমেলা ইত্যাদি বহু মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন-ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষেরাও এখানে নানান অনুষ্ঠান ও উৎসব করে থাকেন।

উত্তর ২৪-পরগনা জেলাঃ হালিশহরের কালীপূজার মেলা, দক্ষিণেশ্বরের কল্পতরু উৎসব আর মেলা।

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলাঃ গাজীসাহেবের মেলা, পীরসাহেবের মেলা, ঘুটিয়ারী শরিফের মেলা, গঙ্গাসাগর মেলা প্রভৃতি।

অনুশীলনী

১। অল্প কথায় উত্তর দাওঃ
(ক) পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ মানুষ কোন্ ভাষায় কথা বলেন?
(খ) পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাধারণত কোন্ কোন্ ভাষায় কথা বলেন?
(গ) পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা বেশি পোশাক-পরিচ্ছদ পরেন কেন?
(ঘ) সমতল অঞ্চলের মানুষ অল্প পোশাক ব্যবহার করেন কেন?
(ঙ) কোন্ জেলার প্রধান ভাষা গোর্খালি?
(চ) পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রধান উৎসবের নাম করো।
(ছ) দার্জিলিঙ জেলার অধিবাসীরা কী কী পোশাক-পরিচ্ছদ পরেন?
(জ) সমতল অঞ্চলের অধিবাসীরা কী-রকম পোশাক পরেন?
(ঝ) "উৎসব" কথার সাধারণ অর্থ কী?

২। নীচের উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি কোন্ কোন্ জেলার তা বলোঃ
(ক) শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, (খ) মাহেশের রথযাত্রা, (গ) শান্তিপুরের রাসমেলা, (ঘ) ভাওয়াইয়া গান, (ঙ) গঙ্গাসাগর মেলা, (চ) গিয়াসউদ্দীন সাহেবের মেলা, (ছ) পীরবাহারামের মেলা, (জ) ভাইটীকা, (ঝ) নাজিরপুরের মেলা, (ঞ) দক্ষিণেশ্বরের কল্পতরু উৎসব আর মেলা, (ট) জয়চণ্ডী মেলা, (ঠ) শিবরাত্রিতে জল্পেশ্বরের মেলা, (ড) বেরা উৎসব, (ঢ) ছো-নাচ, (ণ) ভাদু উৎসব, (ত) বঙ্গসংস্কৃতি মলা, (থ) টুসুর মেলা, (দ) ফুরফুরার উরস উৎসব, (ধ) রামকেলি মেলা, (ন) সাঁওতালদের বাদনা পরব, (প) চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপূজা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজ্যের প্রাকৃতিক গঠন—প্রধান প্রধান নদী, সমুদ্র, পাহাড়, যোগাযোগব্যবস্থা, জলবায়ু ও তার প্রভাব

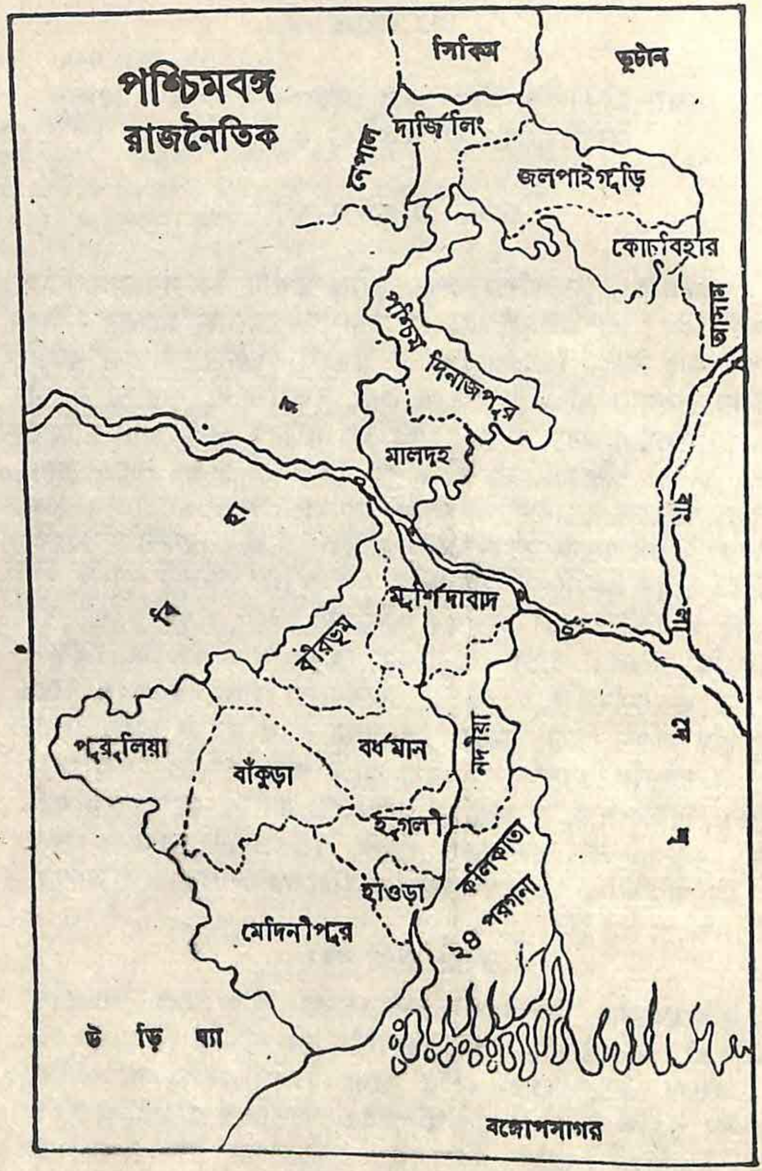
রাজ্যের প্রাকৃতিক গঠন

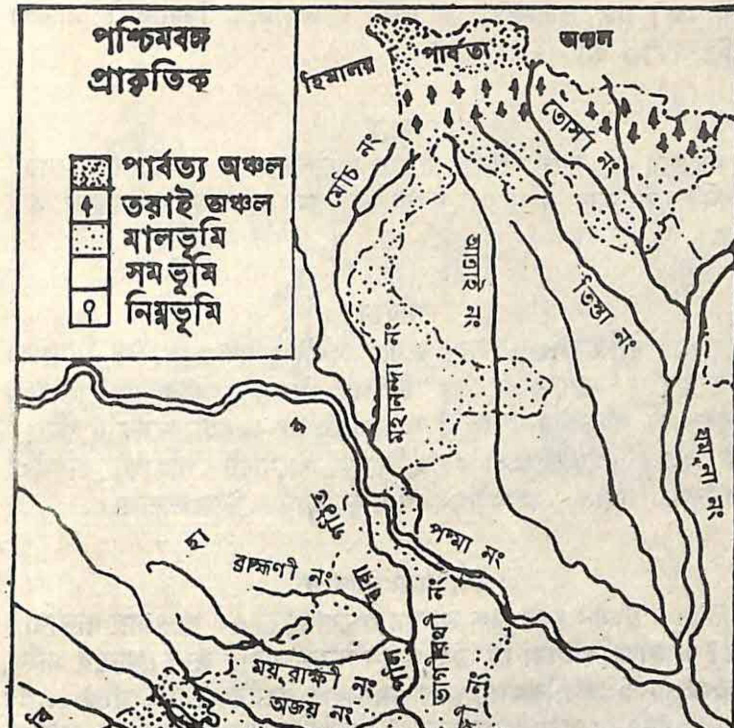
আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ভূমির প্রকৃতি কি সব জায়গাতেই একই রকম? তা নিশ্চয়ই নয়। তোমরা তো জেনেছ, রাজ্যের দক্ষিণে সাগর আর উত্তরে হিমালয় পর্বত। কাজেই রাজ্যের কোথাও সমতল আবার কোথাও বা উঁচু জায়গা এবং পাহাড়ি বা পার্বত্য এলাকা রয়েছে। আমরা এবার রাজ্যের প্রাকৃতিক গঠনের একটু পরিচয় জেনে নিই। পাশে পশ্চিমবঙ্গের রঙিন যে মানচিত্রটি দেখছ তাতে নানান রঙের সাহায্যে কোথায় মালভূমি, কোথায় সমভূমি আর কোথায় পার্বত্য অঞ্চল রয়েছে তা দেখানো হয়েছে। রাজ্যের একেবারে উত্তরের বাদামি রঙের অংশটি **পার্বত্য অঞ্চল**। দার্জিলিঙ জেলার বেশির ভাগ অংশই পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে। পশ্চিমের হলুদ রঙের অংশটা হল **মালভূমি অঞ্চল**। পুরো পুরুলিয়া জেলা আর বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার একেবারে পশ্চিমের অংশ নিয়ে মালভূমি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া বাকি সবুজ রঙের বিরাট অংশটা **সমভূমি অঞ্চল**। এর মধ্যে আছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪-পরগনা, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪-পরগনা এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পূর্বদিকের বেশির ভাগ অংশ।

প্রধান প্রধান নদী

পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান নদী গঙ্গা আর তার শাখানদী ভাগীরথী। ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশটির নাম হুগলি নদী।

রাজ্যের উত্তরভাগের নদীর মধ্যে তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, মহানন্দা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের নদ-নদীর মধ্যে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাই, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে করা যায়। পূর্বদিকের উল্লেখ-


পশ্চিমবঙ্গ
রাজনৈতিক
সিকিম
ভূটান
নেপাল
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
আসাম
পশ্চিম দিনাজপুর
মালদহ
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বর্ধমান
নদীয়া
হুগলী
হাওড়া
কলিকাতা
মেদিনীপুর
২৪ পরগনা
উ ড়ি ষ্যা
বঙ্গোপসাগর


পশ্চিমবঙ্গ
প্রাকৃতিক
পার্বত্য অঞ্চল
তরাই অঞ্চল
মালভূমি
সমভূমি
নিম্নভূমি
হিমালয়
পার্বত্য
অঞ্চল
তোর্সা নং
মেচি নং
আত্রাই নং
তিস্তা নং
মহানন্দা নং
যমুনা নং
পদ্মা নং
ব্রাহ্মণী নং
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
দামোদর নং
দ্বারকেশ্বর নং
শিলাই নং
কংসাবতী নং
রূপনারায়ণ নং
হলদী নং
সুবর্ণরেখা নং
ভাগীরথী নং
জলঙ্গী নং
গঙ্গা-ভাগীরথী
হুগলী নং
ইছামতী নং
সুন্দরবন
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর

যোগ্য নদী হল জলঙ্গী। এ ছাড়া দক্ষিণদিকে বিদ্যাধরী, মাতলা প্রভৃতি নদীও আছে।

সমুদ্র

রাজ্যের একেবারে দক্ষিণে রয়েছে সমুদ্র। নাম তার বঙ্গোপসাগর। মেদিনীপুর আর দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলাকে ছুঁয়ে রয়েছে এই সাগর।

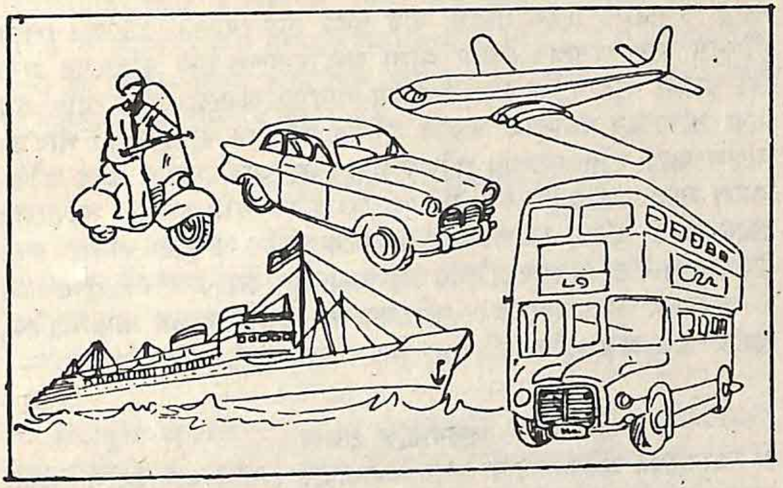
পাহাড়

উত্তরে দার্জিলিঙ জেলায় রয়েছে বরফে আচ্ছন্ন সুউচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণী। সান্দাকফু ও টাইগার হিল এখানকার অন্যতম গিরিশৃঙ্গ। পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে ছোটো-ছোটো কয়েকটি পাহাড় দেখা যায়। এদের মধ্যে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়, বিহারীনাথ পাহাড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগব্যবস্থা

আমরা কেমন করে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যাতায়াত করি? কাছাকাছি হলে হেঁটেই যাই। দূরে যাবার জন্য গোরুর গাড়ি, সাইকেল, সাইকেল-রিকশা, বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, মোটরগাড়ি—এসব ব্যবহার করি। আবার যেখানে নদী, খাল আছে সেখানে নৌকো, স্টীমার, লঞ্চ প্রভৃতির সাহায্যে যোগাযোগ করা যায়। বেশি দূরে দ্রুত যাতায়াত আর মাল পরিবহণের জন্য রেলগাড়ি, ট্রাক ব্যবহার করা হয়। খুব দূরে অনেক কম সময়ে যাতায়াতের জন্য বিমানের সাহায্য নেওয়া হয়। সাইকেল, বাস, ট্যাক্সি, মোটরগাড়ি, নৌকো, স্টীমার, লঞ্চ, রেলগাড়ি, বিমান—এগুলি হল যোগাযোগের মাধ্যম। এদের বলা হয় যানবাহন। আবার সশরীরে যাতায়াত না করেও টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, বেতার প্রভৃতির মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি দূরে-দূরে যোগাযোগ করা যায়।

যানবাহনগুলি চলাচল করতে হলে পথ চাই। তোমরা পায়ে-চলা পথ দেখেছ। ঐ পথ হয়তো কোনো ছোটো রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। ছোটো-ছোটো অমন অনেক রাস্তা আবার বড়ো পাকা রাস্তায় মিশেছে। ওই পাকা রাস্তাগুলো হয়তো আরও বড়ো পাকা রাস্তা



বা জাতীয় সড়কে গিয়ে মিশেছ। জাতীয় সড়ক দিয়ে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যোগাযোগ করা যায়। স্থলভাগের ওপর এই পথগুলি রয়েছে বলে এদের বলা হয় স্থলপথ। স্থলভাগে খুব দ্রুত যোগাযোগের জন্য রয়েছে রেলপথ। কাজেই স্থলপথের দুটি ভাগ—সড়কপথ এবং রেলপথ। পশ্চিমবঙ্গ নদীনালার দেশ। এখানে জলপথেও যোগাযোগ করা যায়। বিমান তো আকাশে ওড়ে। কাজেই আকাশপথে খুব অল্প সময়ে বেশি দূরস্থানে যোগাযোগ করা যায়। আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন সড়কপথ আর রেলপথ জালের মতো ছড়িয়ে আছে। কাছাকাছি অথবা দূরের জায়গার সঙ্গে আমরা খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছি।

জলবায়ু

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল বাদে রাজ্যের সর্বত্রই গরম এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। সেই কারণে ঘাম বেশি হয়। গ্রীষ্মকালটা তাই কষ্টদায়ক। উত্তরে গরমের প্রকোপ কম। দক্ষিণবঙ্গে

যতই পশ্চিমের দিকে যাওয়া যায় গরম তত বেশি। গ্রীষ্মের শেষে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয়-বাষ্প-ভরা বাতাসের জন্য এই রাজ্যে খুব বৃষ্টি হয়। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টি বেশি হয় এবং পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। পার্বত্য অঞ্চল বাদে পশ্চিমবঙ্গের শীতকালটা বেশ আরামদায়ক, এবং শীতকালে সাধারণত বৃষ্টি হয় না। পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে সমতলের চেয়ে শীত একটু বেশি। সমুদ্র থেকে বেশি উঁচুতে থাকার জন্য উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে গরম বেশ কম থাকে। তাই ওখানে গ্রীষ্মকালটা আরামদায়ক। পশ্চিমবঙ্গে ঋতুর সংখ্যা চার—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ আর শীত।

জলবায়ুর প্রভাব

মানুষের জীবনযাত্রার ওপর জলবায়ুর প্রভাব খুব বেশি। জলবায়ুর ওপর মানুষের কাজকর্ম করবার ক্ষমতা অনেকটা নির্ভর করে। শীতকালে আমরা খুব পরিশ্রম করতে পারি। কিন্তু গ্রীষ্মকালে অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠি। জলবায়ুর ওপর কৃষিজ ফসল, অরণ্যসম্পদ প্রভৃতি নির্ভর করে। বৃষ্টিপাত এবং গরমের পার্থক্যের জন্য নানান জায়গায় নানান সময়ে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয়। কখনও ধান, কখনও গম, আবার কখনও আখ প্রভৃতি হয়। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন শাক-সবজি, ফুল-ফল ফোটে। উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে এক ধরনের অরণ্য, পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে ভিন্ন প্রকৃতির অরণ্য এবং দক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চলে আর-এক রকমের অরণ্য দেখা যায়।

জলবায়ুর ওপর আমাদের খাদ্য, বাসগৃহ আর পোশাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য দেখা যায়। আর যে অঞ্চলে প্রধানত যেসব ফসল হয় সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত তাই খায়। বিভিন্ন স্থানে বাড়ি-ঘরের পার্থক্যও বেশ চোখে পড়ে। পার্বত্য অঞ্চলে বাড়ি-ঘর বেশিরভাগ কাঠের তৈরি। সমভূমি অঞ্চলে গ্রামের দিকে দেখা যায় খড়ের ঢালু-চালওয়ালা মাটির বাড়ি। এইরকম বাড়ি গরমের দিনে ঠান্ডা আর শীতের দিনে গরম থাকে। চাল ঢালু থাকার জন্য বৃষ্টির জল সহজেই গড়িয়ে যেতে পারে। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা গরমের দিনে হালকা ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরি আর শীতকালে

আঁটোসাঁটো গরম ও পশমের জামা-কাপড় ব্যবহার করি। জলবায়ুর ওপর অধিবাসীদের জীবিকাও অনেকখানি নির্ভর করে। জলবায়ুর জন্য এই রাজ্য একটি কৃষি-প্রধান অঞ্চল। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ অধিবাসী কৃষিজীবী।

ভৌগোলিক শব্দভাণ্ডার

প্রাকৃতিক গঠনঃ ভূমির প্রকৃতি কেমন—উঁচু, নীচু, একই তলে অবস্থিত কিনা ইত্যাদি বোঝানোকে প্রাকৃতিক গঠন বলা হয়।

সমভূমি অঞ্চলঃ বিরাট এলাকা জুড়ে সমুদ্রের প্রায় সমান তলে কোনো রকম উঁচু-নীচু ছাড়া সমান যে জমি, তাকে সমভূমি অঞ্চল বলে।

মালভূমি অঞ্চলঃ চারদিকের সমতলভূমি থেকে উঁচু প্রায় অনেকটা জায়গা জুড়ে যে এলাকা—যার ওপরটা ঢেউখেলানো বা সমান—তাকে বলে মালভূমি অঞ্চল। অনেকটা উলটানো বাটির মতো যেন।

পার্বত্য অঞ্চলঃ পাহাড়-পর্বতে পূর্ণ অঞ্চলকে বলা হয় পার্বত্য অঞ্চল।

গিরিশৃঙ্গঃ পর্বতের উঁচু চূড়াকে গিরিশৃঙ্গ বলে।

জলবায়ুঃ কোনো অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে কতটা গরম বা ঠাণ্ডা পড়ে এবং সেখানে বৃষ্টি কী-রকম হয়, এই সবকেই সেই জায়গার জলবায়ু বলে।

অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

১। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত কী কী ধরনের ভূমির রূপ দেখা যায়?
২। কোন্ জেলার বেশির ভাগ অংশই পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে পড়ে?
৩। কোন্ জেলার পুরোটাই মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে?
৪। কোন্ কোন্ জেলার পশ্চিম অংশ মালভূমির মধ্যে রয়েছে?
৫। কোন্ কোন্ জেলার পুরোটাই সমতল অঞ্চল?
৬। পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান নদীর নাম কী?
৭। ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশ কী নামে পরিচিত?
৮। রাজ্যের উত্তর ভাগের প্রধান নদী কী কী?
৯। পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের কয়েকটি নদীর নাম করো।
১০। রাজ্যের দক্ষিণে যে সাগর আছে, তার নাম কী?
১১। কোন্ কোন্ জেলা সমুদ্রের ধারে অবস্থিত?
১২। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে কোন্ পর্বতশ্রেণী আছে?
১৩। রাজ্যের দুটি গিরিশৃঙ্গের নাম করো।
১৪। অযোধ্যা পাহাড়টি কোন্ জেলায় আছে?
১৫। বাঁকুড়া জেলায় কী কী পাহাড় আছে?
১৬। যানবাহন বলতে কী বোঝ?
১৭। স্থলপথকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?
১৮। সশরীরে যাতায়াত না করেও কোন্ কোন্ মাধ্যমে খুব দ্রুত যোগাযোগ করা যায়?
১৯। পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্মকালটা কষ্টদায়ক কেন?
২০। রাজ্যের কোথায় বেশি গরম পড়ে?
২১। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে গরম কম থাকে কেন?
২২। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশি?
২৩। মানুষের জীবনযাত্রার ওপর কার প্রভাব খুব বেশি?
২৪। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল ও দক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের অরণ্য দেখা যায় কেন?
২৫। গ্রামাঞ্চলে খড়ের চাল-চালওয়ালা বাড়ি দেখা যায় কেন?
২৬। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সর্বপ্রধান জীবিকা কী?

পরিশিষ্ট

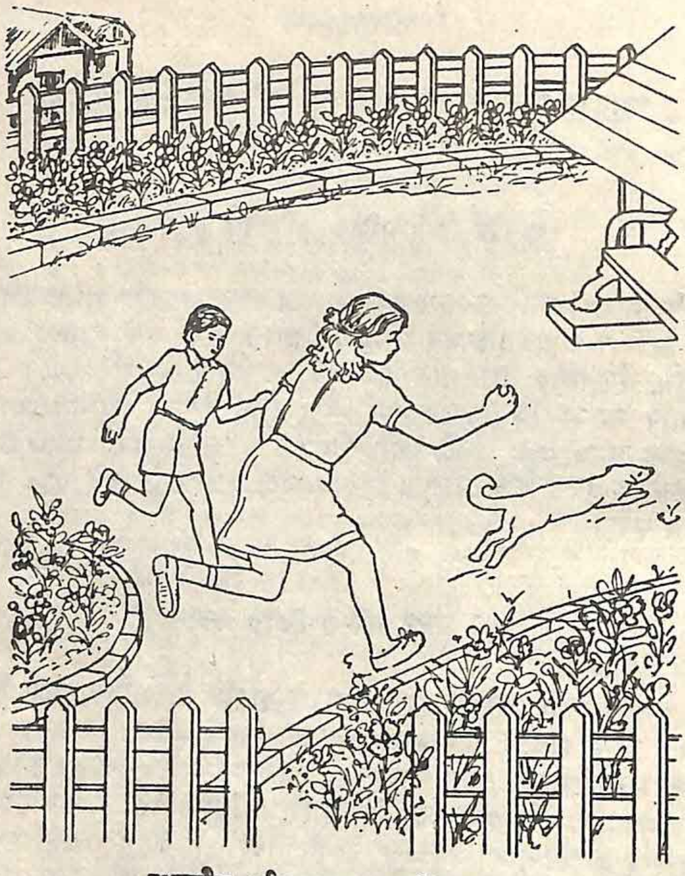
স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ—নকশা তৈরি, ভূ-গোলকের সঙ্গে পরিচিতি

স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ ও নকশা

তুমি যে এলাকায় বাস কর তোমার সেই স্থানীয় পরিবেশে কত কী জিনিস রয়েছে। যেমন তোমার নিজের বাড়ি, হাট, বাজার, রাস্তা, পুকুর, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কৃষিখেত, হয়তো বা কোনো নদী ইত্যাদি অনেক কিছু। তোমার পরিবেশের এইসব জিনিস কোন্‌টি কোথায় আছে, এবং কতটা জায়গা জুড়ে আছে, খাতার কাগজে মোটা-মুটিভাবে এঁকে যদি দেখিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তাকেই বলে নকশা তৈরি করা।

কী ভাবে নকশা তৈরি করবে

নকশা তৈরি করতে হলে প্রথমেই চারটি দিক ঠিক করে নিতে হবে। মনে রাখবে, কাগজের ওপরের দিকটা উত্তর, নীচের দিক দক্ষিণ। আর ডান দিকটা পূর্ব আর বাঁ দিকটা হল পশ্চিম। তীরচিহ্ন দিয়ে কাগজে পরিষ্কার করে দিকগুলি দেখিয়ে দাও। এবার তোমার এলাকার রাস্তাগুলো কোন্‌টা কোন্‌ দিকে কিভাবে গেছে কাগজে সেইভাবে রেখা টেনে এঁকে ফেলো। তারপর ওই রাস্তাগুলোর কোন্‌ দিকে কোন্‌ কোন্‌ জিনিস আছে, কাগজে সেভাবে তাদের অবস্থান দেখাও। পরিবেশের বড়ো-বড়ো জিনিসগুলিকে ছোট্ট কাগজে দেখাতে হচ্ছে। কাজেই তাদের কোন্‌টির আকার কেমন সেইভাবে দেখাতে হবে এবং একটা থেকে আর-একটা কতটা দূরে রয়েছে, মোটামুটি-ভাবে নকশাতে তাও বোঝাতে হবে। সবশেষে নকশার কোন্‌ জিনিসটি কী, তা ছোটো করে নাম লিখে বলে দিতে হবে। এইভাবে তোমার স্থানীয় পরিবেশের নকশা তৈরি করা যেতে পারে। ওই নকশা থেকে তোমার পরিবেশ সম্পর্কে একটি সুন্দর ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

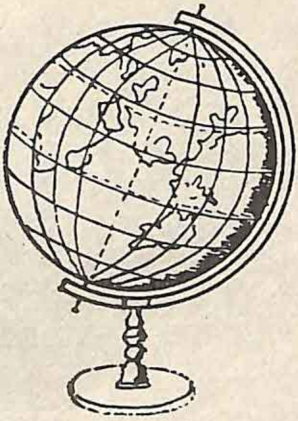


স্থানীয় পরিবেশের একটি নকশা

উপরের ছবিতে স্থানীয় পরিবেশের একটি নকশা দেখানো হল। ভালো করে খেয়াল করে দেখো পরিবেশের বিশেষ জিনিসগুলির অবস্থান কেমনভাবে দেখানো হয়েছে। এবার তুমি চেষ্টা করে দেখো—তোমার স্থানীয় পরিবেশের একটি নকশা তৈরি করতে পার কিনা। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে।

ভূ-গোলক পরিচিতি

তোমরা তো জান, আমাদের পৃথিবীটা দেখতে প্রায় একটি গোল বলের মতো। আর মহাদেশ, মহাসাগরগুলি রয়েছে পাশাপাশি,



মহাসাগর ঘিরে রেখেছে মহাদেশগুলকে পৃথিবীর বাইরের চারপাশটায়।

শ্রেণীকক্ষে গ্লোব বা ভূ-গোলক নিশ্চয়ই তোমরা দেখবে। বিরাট পৃথিবীটা ছোট্ট ঐ ভূ-গোলকে দেখানো হয়েছে। ভূ-গোলকটি পৃথিবীরই একটি ছোট্ট রূপ। পাশের ছবিটি দেখো। একটি ভূ-গোলক দেখানো হয়েছে। একটি স্ট্যান্ডে কাস্তে আকারের হাতলের ওপর গোলকটি রয়েছে। ছবিতে পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণতম প্রান্ত দুটি দেখানো হয়েছে। ঐ বিন্দু দুটি পৃথিবী ভেদ করে যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে বলে পৃথিবীর মেরুদণ্ড। গ্লোবটি ঐ রেখার ওপর পাক খেতে পারে। হাত দিয়ে একবার ঘুরিয়ে দেখো। আমাদের পৃথিবীও ওইভাবে পাক খাচ্ছে বা ঘুরছে পশ্চিম থেকে পুব দিকে। আর পৃথিবীটা ঠিক অমনি একটু হেলানো থাকে। ভূ-গোলকে মহাদেশ আর মহাসাগর সবই দেখানো আছে। এবার গ্লোবে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলির অবস্থান ভালো করে দেখে নাও। পৃথিবীতে কেমন করে দিন-রাত হয় তা নিজেরা আলো ফেলে বা অন্ধকার করে দেখে নাও।


পশ্চিমবঙ্গ
রাজনৈতিক
সিকিম
ভূটান
নেপাল
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
আসাম
পশ্চিম দিনাজপুর
মালদহ
বি হা র
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
বাং লা দে শ
নদিয়া
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বর্ধমান
হুগলি
হাওড়া
কলিকাতা
২৪ পরগনা
মেদিনীপুর
উ ড়ি ষ্যা
বঙ্গোপসাগর